দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

করোনা ভাইরাস জীবাণু যুদ্ধের অস্ত্র নয়তো ?
— পৃঃ ২৬

রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাই চরম লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন
— পৃঃ ১১

৭২ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ২৩ মার্চ, ২০২০।। ৯ চৈত্র - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

করোনা : বিশ্বের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ

আতঙ্কিত না হয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন ● সর্দি-কাশি জ্বর হলে শীঘ্রই চিকিৎসকের সাহায্য নিন ● সময়মতো চিকিৎসা হলে করোনা আক্রান্তও সেরে উঠবেন ● উপসর্গ দেখা দিলে লুকিয়ে রাখবেন না ● এতে নিজের এবং পরিজনদের বিপদ বাড়বে

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ৯ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৩ মার্চ - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
দাম : ১২ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021
R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com
ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
তৃণমূলের দয়াদাক্ষিণ্যে দু'চার পিস সিপিএম এখনো বেঁচেবর্তে আছে □ বিশ্বামিত্র □ ৬
খোলা চিঠি : রবি গানে অশ্লীলতার দায় কার? □ সুন্দর মৌলিক □ ৭
আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তায় প্রভাব ফেলতে পারে □ সৈয়দ আটা হাসনান □ ৮
রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাই চরম লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন □ সাধন কুমার পাল □ ১১
স্বামীজীর রাম-উপাসনা বাঙ্গালি ভুলে গেছে □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ১৩
বসন্তের রোদ্দুরে বিকৃতির গ্লানি □ সুজিত রায় □ ১৬
করোনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণ সংশয়কারী হবে না □ ডা: দেবাশিস বসু □ ১৮
করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই □ ডা: অরিন্দম বিশ্বাস □ ২৩
সাধারণ চিকিৎসাতেই সারে এই সংক্রমণ □ ডা: বিজয় গুহ রায় □ ২৪
করোনা ভাইরাস জীবাণু যুদ্ধের অস্ত্র নয়তো? □ স্বপন দাস □ ২৬
মহাভারতের পথের দিশারি ডা: হেডগেওয়ার □ বিনয়ভূষণ দাশ □ ৩১
ভারতকে ভালোবেসেছিলেন শার্লোট ক্যানিং □ কৌশিক রায় □ ৩৩
গল্প : চোরেদের পিকনিক □ গৌতম কুমার মণ্ডল □ ৩৫
কলকাতা বন্দরের নামকরণ বিতর্ক □ বিমলেন্দু ঘোষ □ ৩৮
বঙ্গবন্ধু একজন শান্তিদূত : মুজিববর্ষের উদ্বোধনী বার্তায় নরেন্দ্র মোদী □ ৪৩
মোদী সরকার দিল্লির হিংসার ষড়যন্ত্রীদের বিচারের আওতায় আনতে অঙ্গীকারবদ্ধ □ সুজিত রায় □ ৪৪
সংক্রমণ প্রতিহত করতে কেন্দ্র সরকারের পরামর্শ ও নীতি-নির্দেশিকা □ ৪৫
নিয়মিত বিভাগ
উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** □ **খেলা : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □ **চিত্রকথা : ৪২** □ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৯** □ **শব্দরূপ : ৫০**

প্রকাশিত হবে
৩০ মার্চ
২০২০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৩০ মার্চ
২০২০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মাস্ক নিয়ে মাতামাতি

ভারতেও প্রতিনিয়ত বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। সংক্রমণ থেকে বাঁচতে মানুষ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে মাস্ক। কিন্তু বাজার থেকে মাস্ক উধাও। এন-৯৫ মাস্ক তো দূরের কথা সাধারণ মাস্কও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে অসাধু ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো। দুগুণ তিনগুণ দামে কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে মাস্ক।

প্রশ্ন উঠছে, মাস্ক পরাটা কতটা জরুরি? মাস্কের বিকল্প হিসাবে কী করা যেতে পারে? কারা মাস্ক ব্যবহার করবেন? কীভাবে ব্যবহার করবেন? পরিত্যক্ত মাস্ক কী করবেন?

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হবে।

সত্বর কপি বুক করুন।। দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank -
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

করোনা লইয়া রাজনীতি কেন?

আজ বিশ্বের আতঙ্কের নূতন নাম করোনা। উন্নত অর্থনীতির দেশ চীন এই করোনার থাবায় পর্যুদস্ত। চীনেই এই মারণ রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব। এই অবধি সারা বিশ্বে সাড়ে ছয় হাজারেরও অধিক মানুষের জীবনহানি হইয়াছে । দিন দিন এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। চীনের সীমানা ছাড়াইয়া ইতালি, কোরিয়া ও ইরানে বহুল পরিমাণে সংক্রমিত হইয়াছে। চীনের পর ইতালিতেও শুরু হইয়াছে মৃত্যু মিছিল। এ এফ পি'র হিসাব অনুযায়ী এই মারণ রোগ বিশ্বের ১১৭ টি দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রায় দেড় লক্ষের মতো মানুষ আক্রান্ত হইয়াছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইহাকে আন্তর্জাতিক মহামারী রূপে ঘোষণা করিয়াছে। সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমগুলির শিরোনামও এখন করোনা। করোনার আতঙ্কে সারা বিশ্ব যেন গৃহবন্দি হইতে চলিয়াছে। স্কুল-কলেজ ছুটি ঘোষিত হইয়াছে। সভা-সমাবেশ বাতিল করা হইয়াছে। বলিউড-টলিউডের শ্যুটিং বন্ধ হইয়াছে। মানুষজনের নাকে-মুখে কেবলই মাস্ক দেখা যাইতেছে। সকলের চোখে-মুখে কেবলই আতঙ্ক পরিলক্ষিত হইতেছে।

বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন ইহাতে অযথা আতঙ্কিত হইবার কোনো কারণ নাই। চীন ও ইউরোপের মতো ক্ষতিগ্রস্তও হইবে না ভারত, শুধুমাত্র কয়েকটি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে তাহা অনবরত সম্প্রচার করা হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও রাজনীতির কারবারিরা ইহা লইয়া রাজনীতি করিতেও ছাড়িতেছেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন দেশবাসীকে আশ্বস্ত করিতেছেন তখন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। বলিয়াছেন দিল্লির দাঙ্গা হইতে নজর ঘুরাইবার জন্যই নাকি প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে করোনার জুজু দেখাইতেছেন। সেই সঙ্গে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করিয়া মাস্কের দাম দ্বিগুণ লইতেছে। এক স্বঘোষিত বামপন্থী পণ্ডিত আবার করোনাকে রুখিয়া দিতে হিন্দুধর্মের শক্তি পর্যন্ত দেখিতে চাহিয়াছেন।

এই ভয়াবহ বিপদের দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জোরালো পদক্ষেপ লইতে সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির প্রতি ভালো রকমের নীতিকৌশল গ্রহণ করিতে আবেদন করিয়াছেন। ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে এই নীতিকৌশল লইয়া আলোচনা এবং সমগ্র বিশ্বে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে সার্কভুক্ত দেশগুলির একত্রিত ভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবারও তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। একগুচ্ছ টুইটবার্তায় তিনি বলিয়াছেন, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ মানুষই দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করেন। এই অঞ্চলের মানুষদের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি তাই নিশ্চিত করিতে হইবে। কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় সরকার সমস্ত রকমের চেষ্টা চালাইতেছে বলিয়া তিনি জানান। খুবই আনন্দের বিষয়, সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির করোনা মোকাবিলায় যে তহবিল গঠনের প্রস্তাব ভারতের প্রধানমন্ত্রী দিয়াছেন তাহাতে তিনি দশ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। সুতরাং, এই ভয়াবহ বিপদের দিনে স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকরা রাজনীতির খেলা না খেলিয়া বিপদ মোকাবিলায় আগাইয়া আসিলেই সর্বদিক দিয়া মঙ্গল হইবে।

সুভাষিতম্

অর্থাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা।
বিদ্যাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা ক্ষুধাতুরাণাং ন রুচি ন বেলা।।

অর্থলোভীদের সুখ ও নিদ্রা আসে না, কামাতুরদের ভয় ও লজ্জা থাকে না, বিদ্যালাভার্থীদের সুখ ও নিদ্রা থাকে না এবং ক্ষুধার্তদের রুচি ও সময়ের জ্ঞান থাকে না।

তৃণমূলের দয়াদাক্ষিণ্যে দু'চার পিস সিপিএম এখনো বেঁচেবর্তে আছে

বিশ্বামিত্র-র কলম

সম্প্রতি বাম-কংগ্রেস জোটের পক্ষ থেকে রাজ্যসভায় প্রার্থী মনোনীত করা হয়েছে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। অপর পক্ষে তৃণমূলের সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভায় শেষ মুহূর্তে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন দীনেশ বাজাজ। তৃণমূলের চারজন প্রার্থীর নিশ্চিত জয়ের পরে পঞ্চম প্রার্থী হিসেবে বিকাশরঞ্জন নাকি দীনেশ বাজাজ কে জিতবেন তাই নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু দীনেশ বাজাজের মনোনয়নপত্র ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার করণে বাতিল হওয়ায় বিকাশবাবুর জয় একরকম নিশ্চিত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে প্রমাণ হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাম-বিরোধিতা স্পষ্টতই লোকদেখানো। কারণ তাঁর 'অনুপ্রেরণা' না থাকলে দীনেশবাবুর মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ মনোনয়নপত্রে ভুলও করতেন না আর সেই ভুলের সুযোগ নিয়ে বিকাশবাবুর জেতাও হতো না।

এ রাজ্যে তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি। সিপিএম ও কংগ্রেসের অস্তিত্ব অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও আর ধরা পড়ছে না। এই অবস্থায় তৃণমূল-বিজেপি যৌথ প্রার্থী দেবে বলে যারা ভাবছেন তারা মূর্খের জগতে বাস করছেন। কিন্তু এখন হলপ করে বলা যায় বিজেপির ছ'জন বিধায়কের ভোট বিকাশবাবুর বিপক্ষেই যাবে এবং সেটা হওয়াই উচিত। গত লোকসভা নির্বাচনেও দেখেছিলাম বিকাশবাবুর বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজ সম্মিলিত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কারণ, তিনি প্রকাশ্য রাস্তায় নিষিদ্ধ মাংস খেয়েছিলেন। এবং অতি সম্প্রতি তাঁর আর এক কীর্তি সমগ্র হিন্দু সমাজকে তালিবান আখ্যা দেওয়া।

বিকাশবাবুর এহেন হিন্দুবিরোধী মানসিকতাই গত লোকসভা ভোটে তাঁর বিপক্ষে গিয়েছিল। বস্তুত আজকে রাজ্যে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি তার জন্যও বিকাশবাবু মতো রাজনীতিকরা কোনো অংশে কম দায়ী নন। তিনি মুসলমান প্রধান এলাকায় গোমাংস খেতে পারেন, কিন্তু শুয়োরের মাংস খাবার মতো সৎসাহস তাঁর নেই। তাঁরা সাম্প্রদায়িকতা বলতে একতরফা ভাবে মুসলমান তোষণ বোঝেন এবং যতদিন সরকারে ক্ষমতায় ছিলেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উসকানি দিয়েছিলেন ভোটের স্বার্থ চরিতার্থ করতে।

নির্জলা খাঁটি সত্যি এটাই যে, বিকাশবাবুর বিরুদ্ধে সামগ্রিক ভাবে হিন্দু সমাজ জেগেছে। বামপন্থীদের চৌত্রিশ বছরের যাবতীয় অপকীর্তির মধ্যে প্রধানতর অপকীর্তি হলো মুসলমান তোষণের মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে অবদমিত করে রাখা। কিন্তু পাপ কখনোও চাপা থাকে না। তাই লোকসভা থেকে অবলুপ্তির পরে রাজ্যসভা থেকেও তাদের বিদায় জানানোর সময় এসেছে। 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদী' শব্দটি আমদানি করার জন্য এই ইতালির মহিলাটি যত-না দায়ী বিদেশিদের দালালি করে আসা বামপন্থীরা তার চাইতে কোনো অংশে কম দায়ী নন। বিকাশবাবুদের এটা বোঝা উচিত, যখন রাজ্যে তাঁরা হাতে মাথা কাটতেন তখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিগির তোলার কাজটা সহজ ছিল। তাই তাদের মুখ্যমন্ত্রী গর্বোদ্ধত আচরণ করে বলতে পেরেছিলেন—'দু'চার পিস আরএসএসের মাথা গুড়িয়ে দেব।'

অদৃষ্টের পরিহাস যে তাদেরই এখন মাথা গুড়িয়ে গেছে। তৃণমূলের দয়াদাক্ষিণ্যে দু'চার পিস সিপিএম এখনও বেঁচেবর্তে আছে, নইলে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হতো। এমনকী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও তৃণমূলের দয়াদক্ষিণ্যেই জিতবেন। বামপন্থীদের উচিত দেওয়াল লিখনটা পড়া। নীচের তলার কেউ কেউ সেটা অবশ্য পড়তে পারছেন। তাই তাদের পার্টি অফিসেই অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তনের আয়োজন করা চলছে। অবশ্য এই প্রয়োজনটি এখনোও উঁচুতলায় অনুভূত হচ্ছে না। তাই বিকাশবাবু হিন্দুদের অক্লেশে তালিবান বলতে পারেন এবং সম্ভবত বলার সময় এটা ভুলে যান যে দমদম দাওয়াই দেওয়ার দিন তাঁদের ফুরিয়েছে। তাদের মাথা ভাঙার ক্ষমতা নেই। কিন্তু এখন হিন্দুদের দমদম দাওয়াই দেবার দিন বা মাথা ভাঙার ক্ষমতা দুই-ই আছে।

বামপন্থীদের উচিত দেওয়াল লিখনটা পড়া। নীচের তলার কেউ কেউ সেটা অবশ্য পড়তে পারছেন। তাই তাদের পার্টি অফিসেই অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তনের আয়োজন করা চলছে। অবশ্য এই প্রয়োজনটি এখনোও উঁচুতলায় অনুভূত হচ্ছে না। তাই বিকাশবাবু হিন্দুদের অক্লেশে তালিবান বলতে পারেন

রবি গানে অশ্লীলতার দায় কার?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা

অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল...। এমন গান শুনেই তো বাঙ্গালির বড়ো হওয়া। কিন্তু এমন রোদ্দুর কি হতে চেয়েছিল? যে রোদ্দুরের দাপটে রবীন্দ্র গানে অশ্লীল শব্দের ব্যবহারটা হয়ে উঠবে স্বাভাবিক!

ছেলে-মেয়েদের কীর্তি দেখে আঘাত পেয়েছেন অনেকে। পাওয়াই স্বাভাবিক। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় শিক্ষালাভের জন্য। সেখানে তারা অপভাষা প্রয়োগ করতে শিখবে, রবীন্দ্র সংগীতকে বিকৃত করবে, এমনটা কখনোই কাম্য নয়।

ব্যাপারটা ছোঁয়াচে। সোশ্যাল মিডিয়ার আগেই সেই অসুখ টের পাওয়া গেছে। কিন্তু সেটা চোখ খুলে দিল রবীন্দ্র ভারতীকাণ্ডে। রোগের মতোই ছড়াচ্ছে। প্রথমে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। তারপর মালদহের স্কুলে। ছেলে-মেয়েরা বুকে-পিঠে অশ্লীল শব্দ লিখে, কখনোও বা গান গেয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তোলো ছবিতে দেখা যায়, গুটিকতক ছেলে-মেয়ে রবীন্দ্রনাথের গানে অশ্লীল শব্দ বসিয়ে নিজেদের পিঠে ও বুকে গেঞ্জির ওপরে লিখে রেখেছে। বারাসাতের স্কুলে তোলা ভিডিয়োয় দেখা যায়, ছেলেরা ক্লাসরুমে বসে অশ্লীল শব্দ বসিয়ে গান গাইছে। মালদহের স্কুলেও উঁচু ক্লাসের কয়েকটি মেয়েকে ভিডিয়ো ক্যামেরার সামনে অশ্লীল শব্দে গান গাইতে দেখা গিয়েছে।

ছাত্রদের মধ্যে অপভাষা ও গালমন্দের প্রচলন চিরকালই আছে। ছেলেরা প্রাথমিকের গণ্ডি ডিঙিয়ে ওই শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়। কথা বলার সময় জায়গামতো শব্দগুলি প্রয়োগ করতে শেখে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের আড্ডায় অবাধে শব্দগুলি প্রয়োগ করা হয়। আগে মেয়েদের মধ্যে অপভাষার চল কম চিল। এখন তা-ও হয়েছে।

আগে এই ভাষাগুলি প্রয়োগ করা হতো একান্তে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটা এসে পড়েছে প্রকাশ্যে। টিনএজারদের সব কিছুতেই বাহাদুরি নেওয়ার প্রবণতা থাকে। অশ্লীল শব্দ লিখে বা গান গেয়েও অনেকে বাহাদুরি নেওয়ার, হিরো হওয়ার চেষ্টা করছে। রবীন্দ্রনাথের গানে অশ্লীল শব্দ বসানোর মধ্যে যে অপরাধজনক কিছু আছে। সেই বোধটাই নেই তাদের।

গালাগালি দেওয়া আসলে হতাশার প্রকাশ। আমাদের রাজ্যের বর্তমান অবস্থায় অনেকেই হতাশ হয়ে পড়ছে। চাকরিবাকরি নেই, অর্থনীতির বিকাশের হার তলানিতে, অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরছে, এই অবস্থায় অনেকে হতাশ হবেই। তা থেকে যেমন অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে, তেমনই বেড়ে চলেছে অপভাষা প্রয়োগের অভ্যাস।

এখন রাস্তা-ঘাটে বেরোলেই নানা অকথা-কুকথা শোনা যায়। বয়স্করাও আজকাল কথায় কথায় অশালীন শব্দ প্রয়োগ করেন। তাঁদের দেখে ছোটো ছেলে-মেয়েরাও যে শিখবে তাতে আশ্চর্য কী!

এর ওপরে আছেন রাজনীতিকরা। এখনকার দিনে তাঁদের মুখে যত অকথা কুকথা শোনা যায়, পাঁচ বছর আগেও তত শোনা যেত কী না সন্দেহ। খোদ মন্ত্রী-সান্ত্রীরাই যদি বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তির বদলে গালি প্রয়োগ করেন, তাহলে ছেলে-মেয়েরা কী শিখবে?

কয়েকটি শিক্ষায়তনে ছেলে-মেয়েরা যা করছে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু শুধু শাস্তির ভয় দেখিয়ে এই প্রবণতা দূর করা যাবে না। সমাজের যাঁরা অভিভাবক, তাঁরা নিজেরা আগে ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা করুন, তবে কমবয়সিরা গালাগলি দিয়ে বাহাদুরি নেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হবে।

সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে শেখালে এই ধরনের অশালীনতা বাড়তেই থাকবে, তাই এখনই সময়। নতুন করে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির প্রতি নব প্রজন্মের মধ্যে শ্রদ্ধা তৈরি করা একান্ত জরুরি।

—সুন্দর মৌলিক

আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তায় প্রভাব ফেলতে পারে

অতিথি কলম

সৈয়দ আটা হাসনান

আমার কর্মজীবনে জম্মু ও কাশ্মীরে নিযুক্ত থাকাকালীন মিডিয়ার কাছ থেকে একটা প্রশ্ন নিয়ম করে শুনতে হতো যে আফগানিস্তানে পরিস্থিতি খারাপ হলে তার কতটা প্রভাব সে রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর পড়ার সম্ভাবনা। আমার চিরাচরিত উত্তর ছিল আফগনিস্তানে অস্থিরতা, যুদ্ধাবস্থা চললে তার খারাপ ফল চুঁইয়ে চুঁইয়ে সীমান্তরাজ্যে আসবেই।

সদ্য আফগানিস্তানে আমেরিকা ও জঙ্গি তালিবানদের মধ্যে চুক্তি নিয়ে আমাকে সেই একই প্রশ্ন আবারও করা হয়েছে, বিশেষ করে ১৯৮৯ সালে উপত্যকায় যে চরম অস্থিরতা শুরু হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে কিনা? বিশেষ করে আমেরিকার নেতৃত্বের মিত্র সেনা বাহিনী যখন আফগানিস্তান থেকে উঠে যাচ্ছে। প্রশ্নটিতে যুক্তি আছে। কেননা ১৯৮৯ সালে তদানীন্তন সোভিয়েত সেনা সরে যাওয়ার পরই কাশ্মীরে অস্থিরতার সূত্রপাত হয়। না, ১৯৮৯-এর ভারত আর ২০২০-র ভারতে আকাশ পাতাল তফাত। এমন দেশ যে কোনো ধরনের বদ অ্যাডভেঞ্চারের মোকাবিলায় অনেক বেশি প্রস্তুত।

সাধারণ যে ধারণাটা বাজারে খুবই চলছে যে আফগানিস্তান থেকে বিদেশি সৈন্য হটে গেলে চুক্তি অনুযায়ী তালিবানরা ক্ষমতায় বসবে। ক্ষমতায় এলেই তখন আর যুদ্ধ চালাবার দরকার না হওয়ায় একটা বড়ো সংখ্যক তালিবান পাকিস্তানের কুখ্যাত Inter service Intelligence (ISI)-এর দিকে চলে যাবে। যাদের কাজে লাগাতে পাকিস্তান সদা উন্মুখ। এই কর্মহীন জঙ্গি তালিবানি যোদ্ধাদের পাকিস্তান চাকরি দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে ঢোকানোর চেষ্টা করবে ঠিক যেমন ১৯৮৯-৯০-এ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীরে কড়া প্রশাসনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীর যে সংখ্যা মাত্র ২৫০-এর কাছাকাছি নেমে এসেছিল হঠাৎ তাতে বৃদ্ধি ঘটবে, চরম অস্থিরতার সময় যা ৭ হাজারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ '৮৯-৯০-এর পুনরাবৃত্তি। এই মতের প্রবক্তারা প্রায় ধরেই নিয়েছেন যে সেই কালো দিন ফিরে এল বলে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পাকিস্তানের মনোভাবে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। জম্মু ও কাশ্মীরে অস্থিরতা ও আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি করে গণহত্যা চালিয়ে একটি দীর্ঘকালীন হিংসার পরিস্থিতি তৈরির মাধ্যমে তারা বারবার ভারতকে পরীক্ষা করে। এই ভাবে ছায়াযুদ্ধের পরিস্থিতি বজায় রাখার বিকৃত মানসিকতা তারা কখনই ছাড়েনি। পাকিস্তানের মনে এখনও একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে কাশ্মীরের পিরপাঞ্জাল পর্বতমালা অঞ্চল সংলগ্ন বড়ো সংখ্যার মানুষজনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যথেষ্ট দুর্বল। তাদের ভারতের বিরুদ্ধে সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে, শুধু কিছুটা ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেওয়ার অপেক্ষা। এই সূত্রে আফগান, পাকিস্তানি ও স্থানীয় সন্ত্রাসবাদীদের একজোট করে আবার ভারত বিরোধী প্রচার চালিয়ে হিংসার মাধ্যমে ভারতের যত বেশি ক্ষতি করা যায় এই চিন্তা পাকিস্তানে সদা সক্রিয়। আর এই ভাবে কাশ্মীরিদের মধ্যে ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদে মদত দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট ভারতবাসীর মনকে বিষিয়ে তুলতে পারলে সারা ভারতের সামগ্রিক সামাজিক পরিমণ্ডলে একটা মুসলমান বিরোধী আবহ তৈরি করা সহজ হবে। ভারতে সৌহার্দ্র ও প্রীতির পরিবেশ ধ্বংস করতে সুবিধে হবে।

বর্তমান আফগানিস্তান এখন একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত যদি এটা ধরে নেয় যে আফগানিস্তানের জাতীয় সেনাবাহিনী ও তালিবানি জঙ্গিরা মিলে মিশে একটি সম্মিলিত শক্তি তৈরি করবে ও শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে তাহলে সেটা ভুল। ওই তালিবানদের মধ্যে থেকে আইএসআই-এ যোগ দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে আগুন জ্বালানোর ভাড়াটে খুনি হিসেবে কাজ করার লোকের অভাব হবে না। এত কিছু সত্ত্বেও পাকিস্তানের চরম কট্টরপন্থী সামরিক শাসক ও ভারত বিদ্বেষীরা এটা নিজেদের মধ্যে মানতে বাধ্য হয়েছে যে ২০২০-র ভারতের কাশ্মীর পরিস্থিতির কোনো সাযুজ্য ১৯৮৯-এর সঙ্গে নেই। সেই কালপর্বে ভারতীয় সেনা শ্রীলঙ্কা থেকে সুদূর পঞ্জাব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় নানা সমস্যা ঠেকাতে সদা ব্যতিব্যস্ত ছিল। সেখানে ঢিলেমি দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ছিল না। কাশ্মীর উপত্যকায় মাত্র ১ ডিভিসন সেনা মজুত ছিল

কাশ্মীরে আরও স্থিরতা ও শান্তির পরিবেশ ফিরুক এমন অপেক্ষায় না থেকে এখনই সমাজের নীচু স্তর থেকে সাধারণ কাশ্মীরিদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যে কাজ করা, একই সঙ্গে টাকার জোগান বন্ধ করে দেওয়া— এই দুটিই সরকারের প্রধান অস্ত্র হওয়া উচিত।

যাদের সঙ্গে কয়েকটি অন্য ক্যাডারের আধা সামরিক বাহিনী সঙ্গী হিসেবে হাজিরা দিত। ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে মার খাওয়ার পর ভারতের সদা পাহারা দেওয়ার লাইন অব কন্ট্রোল অনেক ছোটো হয়ে এসেছে। সে সময় সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলায় কোনো কাউন্টার ইনসারজেনসি বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের অভিজ্ঞতাও ছিল কম। বিগত ৩০ বছর ধরে নানান ছায়াযুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ আজ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী। দু'টি বিশাল সংখ্যার পদাতিক বাহিনী ও কয়েকটি স্বতন্ত্র সক্ষম ব্রিগেড নিয়ন্ত্রণরেখার সামনে অপ্রতিরোধ্য দুর্জয় প্রতিরক্ষায় মোতায়ন রয়েছে।

এদের ঠিক পেছনেই সদা জাগ্রত রাষ্ট্রীয় রাইফেল (RR) যা ভারতের উৎকৃষ্টতম সেনাবাহিনী তৈরি করার যে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার সফলতম উদাহরণ হিসেবে দণ্ডায়মান। সমগ্র RR-এর দুই তৃতীয়াংশ উপত্যকা পাহারা দিচ্ছে। এদের প্রশিক্ষণের মূল অভিমুখই হলো— (১) সদা সর্বদা দায়িত্বে নিযুক্ত থাকা, (২) স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের বিশ্বাস অর্জন করা, (৩) উপত্যকায় শান্তি ও সুস্থিরতা কোনো ভাবেই বিঘ্নিত না হতে দেওয়া।

এর সঙ্গে সোনায় সোহাগা হিসেবে রয়েছে CRPF যারা সর্বাধিক আত্মবিশ্বাসী ও RR বাহিনীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্ঘবদ্ধ হিসেবে কাজ করে চলেছে। এই পটভূমিতে পাকিস্তান চারটি কৌশল প্রয়োগ করে পরিস্থিতি উত্তেজক করে তোলার চেষ্ট করতে পারে। (১) নাগাড়ে লোক ঢোকানো, (২) সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, (৩) গণ বিক্ষোভের আয়োজন, (৪) প্রচার মাধ্যম ও মসজিদের মৌলানাদের মাধ্যমে লোক ক্ষেপিয়ে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে তোলা।

পাকিস্তানের জানা উচিত ২০০৪-এর পর থেকে এলওসি অঞ্চলে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যাপক কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সমেত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নজরদারি ব্যবস্থা বিপুল বাড়ানো হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফল হাতেনাতে পাওয়া গেছে। অবশ্য অতি দুর্গম অঞ্চল দিয়ে সীমানা ভেদ করে প্রবেশের কিছু প্রচেষ্টা এখনও রয়েছে। অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসবাদীদের কাজের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে উপত্যকায় বসবসকারীদের যোগসাজসের ওপর। একই সঙ্গে তাদের হাতে বেআইনি অর্থ কতটা মজুত করা হচ্ছে সেটাও একটা বড়ো ফ্যাক্টর। ভারতের নিরাপত্তার আঁটোসাটো বাঁধুনি এই ধরনের কুমতলবের নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। একই সঙ্গে এদের কাজকর্ম কত দূর এগোচ্ছে বা আদৌ এগোচ্ছে কিনা তার ২৪×৭-এর সতর্ক প্রহরা জারি রয়েছে। প্রয়োজনে প্রত্যাঘাতের সর্বাধুনিক সামরিক কৌশল তৈরি থাকছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সন্ত্রাসবাদীদের দলে টানা বা আফগানিস্তান থেকে আমদানি করা বিদেশি সন্ত্রাসবাদী বাহিনী তৈরি করে নতুন করে বড়োসড়ো জেহাদি উন্মাদনা তৈরি করা অতটা সহজ নয়। ৯০-এর দশকের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় এখন ওই ধরনের সন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তির সম্ভবনা সীমিত, কেননা এই স্থানীয় অঞ্চলের সঙ্গে অপরিচিত বিদেশি জেহাদিদের মোকবিলা করতে হবে অনেক উন্নত সর্বাধুনিক প্রায়োগিক দক্ষতাসম্পন্ন ভারতীয় সেনা ও বিভিন্ন প্রতিরোধ বাহিনীর। কিন্তু হিংসার পরিমাণ সীমিত হলেও এর ফলে সামগ্রিক বাতাবরণের যে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তাতে সদ্য চালু হওয়া উন্নয়ন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কারণে দ্রুত নানা প্রকল্পে যুবকদের টেনে আনতে পারলে সন্ত্রাসবাদীদের দলে আসার লোক থাকবে না। তারা ব্যর্থ হবেই। নিরাপত্তা বাহিনী তাদের কর্তব্যে সজাগ থাকবেই, কিন্তু অসামরিক ক্ষেত্রে সরকারের বহুমুখী যোগদান যে কোনো মূল্যে প্রয়োজন। সাফল্যের পথ সামরিক অসমরিক দুটির সংমিশ্রণেই তৈরি হবে।

এই কারণে কাশ্মীরে আরও স্থিরতা ও শান্তির পরিবেশ ফিরুক এমন অপেক্ষায় না থেকে এখনই সমাজের নীচু স্তর থেকে সাধারণ কাশ্মীরিদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যে কাজ করা একই সঙ্গে টাকার জোগান বন্ধ করে দেওয়া--- এই দুটিই সরকারের প্রধান অস্ত্র হওয়া উচিত। বাকি সব ঠিকই আছে। আলোচনার বিষয়বস্তু ও পরিণতি অনেকটাই, অনেক কিছু ফ্যাক্টর-এর স্থির থাকা ধরে নিয়ে তাই কিছুটা অনুমাননির্ভর বলা যেতে পারে। তাই নেতাদের ছাড়া পাওয়া, বিধিনিষেধে শিথিলতার পর পরিস্থিতির অবনতি হলেও হতে পারে ধরে নিয়ে প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

(লেখক কাশ্মীরে নিযুক্ত পূর্বতন লেফট্যান্যান্ট জেনারেল)

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান : ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,

২. প্রকাশনের সময় : সাপ্তাহিক। **৩. মুদ্রকের নাম :** শ্রী সারদা প্রসাদ পাল। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।

৪. প্রকাশকের নাম : শ্রী সারদা প্রসাদ পাল। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।

৫. সম্পাদকের নাম : রন্তিদেব সেনগুপ্ত। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** মানিকতলা গভর্নমেন্ট হাউজিং এস্টেট, ব্লক-আই, ফ্ল্যাট-৮, ভি আই পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪। **মালিকানা :** ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

ঠিকানা : ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬।

ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডাইরেক্টরবৃন্দ :

শ্রী মোহনলাল পারীখ, পারীখ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট, বি কে মার্কেট, ১৬বি, সেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা -৭০০০৭১।

শ্রী অশোক মোদী, ১, লর্ড সিন্‌হা রোড, ফ্ল্যাট-৫এ, অঙ্কুর, কলকাতা-৭০০০৭১।

শ্রী নীলোৎপল মজুমদার, ৩/১১, বিজয়গড়, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২।

শ্রী সারদা প্রসাদ পাল, ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা - ৪।

আমি শ্রী সারদা প্রসাদ পাল সজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ ২৩.০৩.২০২০

শ্রী সারদা প্রসাদ পাল

রম্যরচনা

মায়ের বিল

একদিন এক কিশোর মাকে একটা বিল ধরিয়ে দিল। তাতে লেখা রয়েছে— গাছে জল দেওয়া ১০ টাকা, দোকান থেকে সারাদিনে এটাওটা আনা ১৫ টাকা, ছোটো ভাইকে কোলে নেওয়া ৪০ টাকা, বাইরে ময়লা ফেলে দিয়ে আসার জন্য ২০ টাকা, মশারি খাটানো ৫ টাকা, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা ৪০ টাকা। সর্ব মোট ১৪০ টাকা।

মা বিলটা নিয়ে পড়ে দেখে মুচকি হাসলেন। তাঁর চোখে জল। তারপর একটা কাগজ নিয়ে লিখতে লাগলেন, তোমাকে ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধারণ— বিনা পয়সায়। স্তন্যদুগ্ধ পান করানো— বিনা পয়সায়। তোমার জন্য রাতের পর রাত জেগে কাটানো—বিনা পয়সায়। তোমাকে স্নান করানো—বিনা পয়সায়। তোমার অসুখবিসুখে সেবা করা— বিনা পয়সায়। তোমাকে লেখাপড়া শেখানো— বিনা পয়সায়। তোমাকে গল্প, গান, ছড়া শোনানো— বিনা পয়সায়।

ছেলে মায়ের হাত থেকে বিলটা নিয়ে নীচে লিখে দিল— **মায়ের বিল জীবন দিয়েও পরিশোধ করা সম্ভব নয়।**

উবাচ

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

“আমাদের বিশ্ব বর্তমানে কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সরকার, বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ মানুষ তাদের সামর্থ্য মতো চেষ্টা করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় যেখানে বিশ্বের প্রচুর মানুষের বসবাস সেখানে আমাদের নাগরিকদের সুস্থতার সঙ্গে কোনো আপোশ করা যাবে না।”

ভিডিয়ো কনফারেন্সে সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশের নেতাদের বার্তা

শিবরাজ সিংহ চৌহান
মধ্যপ্রদেশের বিজেপির নেতা

“করোনা ভাইরাসও মধ্যপ্রদেশের কমলনাথের সরকারকে বাঁচাতে পারবে না। এর কারণ উনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন। সেই কারণেই কমলনাথ এড়িয়ে গিয়েছেন আস্থা ভোট।”

করোনার অজুহাতে আস্থাভোট পিছানোর পরিপ্রেক্ষিতে

হেংক বেকেডাম
ভারতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু)-প্রতিনিধি

“কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে করোনার সংক্রমণ রুখতে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা প্রশংসনীয়। এই মারণ ভাইরাস প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর যে নিরলস পরিশ্রম করছে তা এক কথায় প্রশংসনীয়। ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর দায়বদ্ধতা সত্যিই প্রশংসনীয় ও কার্যকরী।”

করোনা মোকাবিলায় ভারতের উদ্যোগের প্রশংসায়।

ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়
ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

“সেনাবাহিনীতে মহিলারা পুরুষদের থেকে কোনো অংশে কম নন। যোগ্যতার নিরিখে তাঁরা কোনো অংশেই পুরুষ অফিসারদের থেকে পিছিয়ে নেই। তাই তাঁদের পার্মানেন্ট কমিশন না দেওয়াটা কার্যত অন্যায়।”

সেনাবাহিনীতে লিঙ্গবৈষম্য খণ্ডনে শীর্ষ আদালতের রায়

রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাই চরম লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন

সাধন কুমার পাল

রামজন্মভূমিতে রামমন্দির শুধুমাত্র আর দশটা মন্দিরের মতো একটি উপাসনাস্থল নয়, এটি ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মর্যাদার প্রতীক। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে সেই ভাবনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে আত্মগ্লানি এ দেশকে এমন ভাবে গ্রাস করেছিল যে ভারতীয়দের একটা ভালো অংশ ভারতের প্রাণপুরুষ রামের জন্মস্থল অযোধ্যায় আক্রমণকারী বাবর নির্মিত অপমান চিহ্ন মসজিদের ধাঁচাকেই ভারতের জাতীয় স্মারক বলে ভাবতে শুরু করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর নতুন ভারত গড়ে তোলার জন্য রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি কোনো ক্ষেত্রেই ভারতের নিজস্ব ভাবনাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ব্রিটিশকে বিদায় দিলেও ব্রিটিশের অনুকরণে তৈরি শাসনতন্ত্র দিয়েই নতুন ভারত গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল। এই শাসনতন্ত্রের চারটি স্তম্ভ লেজিসলেটিভ, এক্সিকিউটিভ, জুডিসিয়ারি ও মিডিয়া।

সংবিধান প্রণেতারা ভারতীয় সংবিধানকে এদেশের ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রয়াস করেছিলেন। এই ভাবনা থেকেই সংবিধান রচনার সময় ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু ছবি এঁকে দেওয়ার জন্য ডাক পড়েছিল প্রবাদপ্রতীম চিত্রকর নন্দলাল বসুর। নন্দলাল বসুর আঁকা সেই সমস্ত ছবি ভারতের মূল সংবিধানে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। মূল সংবিধানের যে পৃষ্ঠায় মৌলিক অধিকারের উল্লেখ রয়েছে সেই পৃষ্ঠাটি শুরু হয়েছে প্রভু রামচন্দ্র, মা সীতা ও লক্ষ্মণের বনবাস থেকে অযোধ্যায় ফিরে আসার দৃশ্য দিয়ে। যে পৃষ্ঠায় ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপ্যাল ও স্টেট পলিসির উল্লেখ আছে তার শুরুতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে গীতার উপদেশ দেওয়ার ছবি আঁকা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হয়েছে নটরাজ, বুদ্ধ, মহাবীর-সহ ভারতের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আঁকা বিভিন্ন ছবি। যত দিন গেছে সংবিধান থেকে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য মুছে দেওয়া হয়েছে। ৪২তম সংবিধান সংশোধন করে ভারতকে তার নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তকমা দেওয়া হয়েছে। এখন তো ভারতীয় গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভের ঘুণাক্রান্ত লড়ঝড়ে চেহারা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, সমস্ত ব্যবস্থাটিতেই ঘনীভূত হচ্ছে সংকট। ভারতে এখন ঘোড়া কেনাবেচার মতো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কেনাবেচা, বুথ দখল, ছাপ্পাভোট, দুর্নীতির দায়ে উচ্চপদে আসীন রাজনৈতিক নেতা, আইএএস, আইপিএসদের জেলযাত্রা, পেইড নিউজ, হলুদ সাংবাদিকতা গা-সওয়া ব্যাপার। ভারতে এখন ন্যায়বিচার বিলম্বিত, মহার্ঘ এবং আমজনতার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এই সংকট শুধু ভারতে নয়, বিশ্বজুড়ে।

১৯২৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর 'ইয়ং ইন্ডিয়ায়' গান্ধীজী লিখেছেন, "রামরাজ্য মানে আমি হিন্দুরাজ বোঝাতে চাইছি না। রামরাজ্য মানে ঈশ্বরের রাজত্ব। আমার কাছে রাম ও রহিম একই। আমি সত্য ও ন্যায় বিচারে ঈশ্বর ব্যাতীত অন্য কোনো ঈশ্বরকে স্বীকার করি না। আমার কল্পনায় রাম এই পৃথিবীতে বাস্তবে ছিলেন কিনা সেটা বড়ো কথা নয়, রামায়ণের প্রাচীন আদর্শ নিঃসন্দেহে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যার সাহায্যে দীর্ঘমেয়াদি ব্যয়বহুল পদ্ধতি ছাড়াই সাধারণ মানুষ দ্রুত ন্যায় বিচার পেতে পারে'। ১৯৩৪ সালে ২ আগস্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় গান্ধীজী লিখেছেন, 'আমার স্বপ্নের রামায়ণ রাজপুত্র ও দরিদ্র কাঙালের সমানাধিকার নিশ্চিত করে।' ১৯৩৭ সালের ২ জানুয়ারি গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় আবার লিখলেন, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে আমি ব্রিটিশ হাউস অব কমন্স, রাশিয়ার সোভিয়েত শাসন, ইতালির ফ্যাসিস্ট শাসন, জার্মানির নাজি শাসনের অনুকরণকে বোঝাতে চাইছি না...আমাদের নিজস্ব কিছু থাকা চাই যা আমাদের সঙ্গে খাপ খায়... আমি এটাকে রামরাজ্য বলি যা নৈতিক আধিপত্যের উপর ভিত্তি করে মানুষের সার্বভৌমত্বকে বর্ণনা করে।' গান্ধীজীর ধারণা অনুসারে রামরাজ্যকে রাজনৈতিক দিক থেকে এই ভাবে বর্ণনা করা যায়, 'ধর্মের ভূমি এবং যা সর্বভূতে একই চেতনা ক্রিয়াশীল এই তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে যুবা, বৃদ্ধ, উচ্চ, নীচ সৃষ্টির সবার এবং এই পৃথিবীর নিজের জন্য সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, ঐকতান নিশ্চিত করে।'

রামায়ণকে আমরা ইতিহাস অথবা পৌরাণিক কাহিনি যাই বলি না কেন এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে রামরাজ্যের ধারণা আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটু বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় রামরাজ্য নামক আদর্শ ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তম্ভের মাঝখানে আরেকটি স্তম্ভ ছিল। ধর্ম, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার সমন্বয়ে নির্মিত সেই স্তম্ভটিই ছিল অন্য সমস্ত স্তম্ভের দৃঢ়তার উৎস, চালিকা শক্তি।

এখানে ধর্ম মানে কোনো উপাসনা পদ্ধতি নয়। 'ধৃ ধাতু' থেকে আসা ধর্ম হচ্ছে সেই সমস্ত নিয়ম যা ব্যক্তি, সমাজ, প্রকৃতি ও পরমেষ্ঠিকে এক সঙ্গে ধারণ করে রাখে। স্বামী বিবেকানন্দও বার বার বলেছেন, 'তোমরা যদি ধর্মকে জাতীয় জীবনের প্রাণ শক্তি না করে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে তার জায়গায় বসাও, তবে তোমরা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। এরকম যাতে না হয়, সেই জন্য তোমাদেরকে সব কাজ করতে হবে ধর্মের মধ্য দিয়ে যা তোমাদের প্রাণ শক্তি।... যদি রক্ত সতেজ ও পরিষ্কার থাকে, তা হলে মানুষের শরীরে কোনো রোগ জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না। ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের রক্ত। যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোনও বাধা না থাকে... যদি এই রক্ত বিশুদ্ধ থাকে, তবে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য যে-কোনও ধরনের বাহ্যিক ত্রুটি— এমনকী দারিদ্র পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে।'

স্বাধীনতা লাভের পর নতুন ভারত রচনার জন্য জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সেই ধর্মকে দূরে সরিয়ে রেখে সোভিয়েত স্টাইলে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নির্মাণের দিকে ঝুঁকে পড়ল। গুরুত্ব পেল না গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজ, রামরাজ্য কিংবা স্বামীজীর ভারত গঠনের ধারণা। এই ভারতের বুকেই গড়ে উঠল ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রবর্জিত এক ব্যবস্থা। যার ফলিত রূপ এখন আমাদের চোখের সামনে। বনবাসে যাওয়ার সময় শ্রীরাম ছিলেন দশরথ পুত্র, অযোধ্যার যুবরাজ। ১৪ বছর বসবাসের কৃচ্ছ্রসাধন লড়াই, সংগ্রাম। রাবণের মৃত্যুর পর লঙ্কাধিপতি হওয়ার মতো প্রলোভনের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যখন 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী' ভাব নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন তখন তিনি মর্যাদা পুরোষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। ভারতীয় সংস্কৃতির বহুমাত্রিক আদর্শের সমাহারের নাম 'শ্রীরাম'। তিনি ছিলেন আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভাই, আদর্শ স্বামী, আদর্শ রাজা। মানব জীবনের সমস্ত গুণাবলীর সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে। একদিকে তিনি ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক, আবার অন্যদিকে সর্বকালের সর্বযুগের আদর্শ প্রজাপালক।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করা হয়। রাবণ ও বানররাজের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেই যুগেও ক্ষমতাধরদের মধ্যে বহুগামিতার প্রচলন ছিল। কিন্তু রামচন্দ্র 'নিজের সহধর্মিণী সীতাকে উদ্ধারের জন্য' অর্থাৎ নারীর সম্মান রক্ষার জন্য ধৈর্য সহকারে সমাজকে সংগঠিত করে, নিজের জীবন পর্যন্ত বাজি রেখে রাবণের মতো দুষ্কৃতীকে তার যোগ্য শাস্তি দিয়েছেন। আবার অযোধ্যায় ফিরে আসার পর সীতাকে নিয়ে প্রজাদের মধ্যে সংশয়ের বার্তা কানে আসতেই তিনি নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুখের কথা না ভেবে তাকে ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসেন। প্রমাণ করলেন রাজার কাছে 'পতিধর্ম' ও 'পরিবার ধর্মের' চেয়ে 'রাজধর্মের' স্থান অনেক উঁচুতে। নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুখ দূরের কথা প্রজামনোরঞ্জনের জন্য যিনি নরকেও যেতে প্রস্তুত সেই রঘুপতি রাঘব রাজা রামের রাজত্ব কেমন ছিল? বাল্মীকি রামায়ণে ঋষি বাল্মীকী লিখেছেন— 'ন পর্যদেবন্বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্। / ন ব্যাধিজং ভয়ন্ ব্যাপি রামে রাজ্যং প্রশাসতি।।' অর্থাৎ রাম যখন রাজ্য শাসন করছিলেন তখন কোনো বিধবাকে বিলাপ করতে শোনা যেত না, হিংস্র প্রাণী থেকে কোনো ভয় ছিল না, ভয় ছিল না রোগব্যাধি থেকেও।

'আসন্বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্রসহস্রিণঃ। / নিরাময়া বিশোকাশ্চ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।।' অর্থাৎ যখন রামচন্দ্র শাসন করতেন সে সময় মানুষ হাজার হাজার সন্তান সন্ততি নিয়ে রোগ ভোগ থেকে মুক্ত হয়ে হাজার বছর বেঁচে থাকতেন।

'সর্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোঽভবৎ। রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিন্সস্পরস্পরম্।।' অর্থাৎ প্রত্যেক জীব আনন্দে বসবাস করতো, পুণ্য অর্জনই ছিল সকলের স্বভাব, শুধুমাত্র রামের দিকে তাকিয়ে কেউ কাউকে হত্যা করতো না। 'নিত্যপুষ্পা নিত্যফলাস্তরবঃ স্কন্ধবিস্তৃতাঃ। / কালবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ।।' অর্থাৎ কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ রহিত হয়ে উদ্ভিদজগৎ ফুলে ফলে সজ্জিত থাকতো, মেঘেরা নিয়মিত বর্ষণ ঘটাতো, বায়ু প্রবাহের স্পর্শও ছিল রোমাঞ্চকর। 'রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ।/ রামভূতং জগাভূদামে রাজ্যং প্রশাসতি।।' অর্থাৎ রামচন্দ্র যখন শাসন করতেন তখন মানুষের আলাপচারিতার কেন্দ্রে ছিলেন শুধু রাম, রাম এবং রাম। সমগ্র জগৎ যেন রামময় হয়ে গিয়েছিল। 'সর্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ।' অর্থাৎ রাম রাজত্বে সমস্ত মানুষ চমৎকার বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত হয়েছিল। পুণ্য অর্জনে সবাই নিজেকে ব্যস্ত রাখতো।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার আলোকে রামরাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে— (১) রামরাজ্যে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল যেখানে শাসক শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই শাসন করতেন। (২) প্রত্যেকের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। (৩) মানুষ দ্রুত ন্যায়বিচার পেত এবং সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিও অত্যন্ত সহজে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। (৪) নীতি ও মূল্যবোধই ছিল আইন ও বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি। সরকারের সমস্ত কাজেই প্রতিফলিত হতো সততা ও স্বচ্ছতার নীতি এবং সরকারও মানুষের কাছ থেকে তাই আশা করতো। (৫) প্রশাসনের কাজে সেনাবাহিনীর কোনো ভূমিকা ছিল না। (৬) রামরাজ্যে সমস্ত মত, পথ সমমর্যাদা ও সম্মান পেত। (৭) ঋষি বাল্মীকি রামরাজ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে যে ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের উল্লেখ করেছেন তাতে এটা স্পষ্ট যে পরিবেশের কোনোরূপ ক্ষতি না করে মানবীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হতো। রামায়ণকে আমরা ইতিহাস অথবা পৌরাণিক কাহিনি যাই বলি না কেন এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে রামরাজ্যের ধারণা আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটু বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় রামরাজ্য নামক আদর্শ ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তম্ভের মাঝখানে আরেকটি স্তম্ভ ছিল। ধর্ম, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার সমন্বয়ে নির্মিত সেই স্তম্ভটিই ছিল অন্য সমস্ত স্তম্ভের দৃঢ়তার উৎস, চালিকা শক্তি। অযোধ্যায় প্রস্তাবিত রামমন্দির হচ্ছে ধর্ম, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার সমন্বয়ে নির্মিত সেই স্তম্ভের প্রতীক। এই প্রতীক যদি লেজিসলেটিভ, এক্সিকিউটিভ, জুডিসিয়ারি ও মিডিয়া এই চারটি স্তম্ভের চালিকা শক্তি হয়ে উঠতে পারে তাহলে সার্থক হবে রামমন্দির নির্মাণ। ■

স্বামীজীর রাম-উপাসনা বাঙ্গালি ভুলে গেছে

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বাঙ্গালি হিন্দুকে মানুষ হতে না দেওয়ার দায় বাঙ্গালি মায়ের উপর চাপানো উচিত নয়। বাঙ্গালি আজ শ্রীরামকৃষ্ণের, স্বামীজীর, রানি রাসমণির শ্রীরাম-সাধনার ধারা বিস্মৃত হয়েছে। বাঙ্গালিকে জানানো হয়নি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রামনামে জারিত ছিলেন। কোন পারম্পর্যে কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় 'শ্রীরাম পাঞ্চালি' লিখেছিলেন, তা কী বাঙ্গালি জানে? বাঙ্গলার লোকসংস্কৃতিতে রামায়ণ, রামযাত্রা যথেষ্ট শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল। বহু বাঙ্গালি নামের প্রথমাংশ, মধ্য-নামে 'রাম' কথাটি প্রায়শই দেখা যেত। বাঙ্গলার বহু স্থানের নামে রাম কথাটি রয়ে গেছে। ভাঙাচোরার পরেও পশ্চিমবঙ্গে এখনও অনেক রামমন্দির রয়েছে বহাল তবিয়তে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, বাঙ্গালির ইস্ট মন্ত্র— ''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ/কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম/রাম রাম হরে হরে।''

যারা বলেন রাম বাঙ্গালির দেবতা নন, তারা বরং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য মন দিয়ে শুনুন, ''বাংলাদেশে যে এক সময়ে সমস্ত জনসাধারণকে একটা ভক্তির প্লাবনে প্লাবিত করিয়া তুলিতেছিল; সেই ভক্তিধারার অভিষেকে উচ্চ-নীচ, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সকলেই, এক আনন্দের মহাযজ্ঞে সম্মিলিত হইয়াছিল— বাংলা রামায়ণ, বিশেষভাবে, বাঙ্গলাদেশের সেই ভক্তিযুগের সৃষ্টি। বাঙ্গলাদেশে সেই যে, এক সময়ে, একটি নবোৎসাহের নব-বসন্ত আসিয়াছিল, সেই উৎসবকালের কাব্যগুলি বাঙ্গালির ছেলে যদি শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করে, তবে দেশের যথার্থ ইতিহাসকে সজীবভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে।'' (যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'সরল কৃত্তিবাস' গ্রন্থের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৫, যে বইয়ের প্রচ্ছদে দেওয়া আছে, ''অমৃত-মধুর এই সীতা-রাম-লীলা।/শুনিলে পাষাণ গলে, জলে ভাসে শিলা।।'')

তা কবে থেকে বাঙ্গালি রাম-নামে জারিত? কৃত্তিবাস তাঁর ভণিতায় নিজের জন্ম সম্পর্কে বলছেন, ''আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাসে'', মানে সেই বছরেরই দিন যেদিন মাঘ মাসের শেষ দিনটি ছিল রবিবার এবং শ্রীপঞ্চমী তিথি বা সরস্বতী পুজো। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষ গণনায় তা নির্ণয় করেছেন ১৩৮৬ থেকে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক মাঘী পঞ্চমীতে অর্থাৎ কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচলীর স্বাদ বাঙ্গালি পেয়েছে অন্তত ছ'শো বছর আগে। অনুমান করা যায় তার আগে থেকেই বাঙ্গলার প্রবুদ্ধ-মহলে রামায়ণের সংস্কৃত কাব্যের চর্চা ছিল যথেষ্ট এবং লোককথায় তার অবিসংবাদিত বিস্তার। লোকায়ত-মানসে এমনই শক্ত ভিত্তি না থাকলে কৃত্তিবাস এমন জনপ্রিয় ও লোকপ্রিয় রামায়ণ কাব্য লিখতে প্রেরণা পেতেন না। আর এমনি এক কবিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'এ বঙ্গের অলঙ্কার' বলবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো, রামায়ণ- বিরোধিতা করতে গিয়ে হিন্দু বিরোধী ভ্রান্ত-সেকুলারি সমাজ তাকে অবাঙ্গালির দেবতা বলে দেগে দিয়েছেন। মনে

রাখতে হবে তুলসীদাসী রামচরিতমানস লেখা হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেক পরে। সম্ভবত রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বির্তকে বাঙ্গালিকে শামিল না করার 'সেকুলারি-চালাকি' করেছিলেন কিছু 'অসত্য কথা-বলা ইতিহাসবেত্তা'। রাম যে বাঙ্গালির আরাধ্য দেবতা ছিলেন, তা নানান সময়ে আলোচনা করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের কুলদেবতা শ্রীরামচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দের রাম-উপাসনা, রানি রাসমণির রঘুবীর-সাধনাকে বাঙ্গালি ভুলে গেছে। বাঙ্গালি কীভাবে ভুলে যায় মহামন্ত্র!

ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনিই রামায়ণের সেরা ভাষ্যকার। কারণ তিনি রামায়ণের কাহিনিতে জারিত হয়েছিলেন এবং আত্তীকরণ করে তা সুপাচ্য সাহিত্য-ব্যঞ্জনে পরিবেশন করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত রামায়ণ পড়লেও রামায়ণ সংক্রান্ত তাঁর সমূহ-ভাষ্য এবং সাহিত্য ও সমাজ সমীক্ষার মূল ভিত্তি ছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণ, যাকে নিয়ে আজও সকল বাঙ্গালি গর্ববোধ করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়ন নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাদের লেখা থেকে জানা যায় সবচাইতে বেশি দাগানো বই যা তিনি পড়েছিলেন এবং বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে আজও সংরক্ষিত রয়েছে তার অন্যতম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত (১৩৪৩) কৃত্তিবাস রামায়ণ। বিশ্বকবি বিশ্বাস করতেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ। বইটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ''কৃত্তিবাসের স্মৃতি নিজেকেই নিজে এতকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা বড়ো কবি তাঁহারা নিজের কাব্যেই নিজের তাজমহল তৈরি করিয়া যান।'' (কৃত্তিবাসকে উপলক্ষ্য করে চট্টগ্রাম সম্মিলনীর সম্পাদককে চিঠি, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, সূত্র : বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪)। জানা যায়, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত রচিত রামচরিত মানস (তুলসীদাস) বইটিও তিনি পড়েছিলেন। এই যে রামায়ণ সম্পর্কে কবির আগ্রহ এটা

শুরু হয়েছিল জীবনের প্রথম পর্যায় থেকেই। বলা ভালো, কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাঁর জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে দেখতে পাই ভৃত্যরাজকতন্ত্রে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের অবাধ্য-মনের আবহ যেন বদলে যেত রামায়ণের আবহে। পাঁচালী গায়ক কিশোরী চাটুজ্জে জোড়াসাঁকোয় আসতেন গান গাইতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ''কৃত্তিবাসী সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল— অনুপ্রাসের ঝকমারি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।'' 'ছেলেবেলা' (১৩৪৭) নামক আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধেও উল্লেখ করেছেন রামায়ণে মজে থাকার কথা, ''ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা।''

রবীন্দ্রনাথের এক সম্পর্কিত দিদিমা (রবীন্দ্রনাথের মায়ের এক সম্পর্কিত খুড়ি)-র মালিকানাধীন কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি বই ছিল। তা পড়তে গিয়ে কোনো করুণ বর্ণনায় তাঁর চোখ দিয়ে যখন জল পড়ত, দিদিমা জোর করে তাঁর হাত থেকে বইটি কেড়ে নিয়ে যেতেন। রামায়ণ পড়ে কান্নার কথা 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ''কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কী নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আজও ভুলি নাই।'' আর দিদিমার মার্বেল কাগজমণ্ডিত কোণ-ছেঁড়া মলাটওয়ালা মলিন বইটির কথা (বইটি রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভবনে সংরক্ষিত ছিল) কবি 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যের 'যাত্রাপথ' কবিতায় অমর করে রেখেছেন, ''কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা/দিদিমায়ের বালিশ-তলায় চাপা,/আলগা মলিন পাতাগুলি, দাগি তাহার মলাট/দিদিমায়ের মতোই যেন বলি-পড়া ললাট।''

অতএব দেখা যায়, ভৃত্যশাসনে রবীন্দ্রনাথের পড়া বইগুলির অন্যতম হলো কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং তার স্মৃতি সারা জীবনের জন্য তাঁর কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার। কিছুটা বড়ো হয়ে তিনি বাবার সঙ্গে হিমালয়ে গিয়ে পড়েছিলেন বাল্মীকি রচিত অনুষ্ঠুভ্ ছন্দের রামায়ণ। কিন্তু তার প্রভাব অতটা ছিল না হয়তো, যতটা না ছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব ছিল তাঁর চেতনায় ও ভাষ্যে।

তাঁর দুটি গীতিনাট্য 'বাল্মিকী প্রতিভা' (১২৮৭) এবং 'কালমৃগয়া' (১২৮৯)-য় সংস্কৃত রামায়ণের প্রভাব রয়েছে। রয়েছে আদিকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের শ্লোক। ১. ''মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ'' এবং ১. ''পুত্র ব্যাসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম''।

'অহল্যার প্রতি' (১২৯৭), 'পতিতা' (১৩০৪) কবিতার কাহিনি নির্মাণ হয়েছে রামায়ণের গভীর পাঠ অনুসরণ করে। 'পুরস্কার' (১৩০০) কবিতাতে ধরা পড়েছে রামায়ণের নির্যাস, 'চিত্রা' কাব্যের 'নগর সংগীত' কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথকে রামায়ণ সম্পর্কিত 'মিথোম্যানিয়ায় আক্রান্ত' হতে দেখি। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ ও 'সহজপাঠ'-এ তো রবীন্দ্রনাথ শিশু মনকে রামায়ণে জারিত করে দিয়েছেন একেবারে!

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে অজস্র রামায়ণ সম্পর্কিত উক্তির উজ্জ্বল উদ্ধার করতে পারবেন তন্বিষ্ট গবেষক, তার পরতে পরতে ভারত সংস্কৃতির প্রতি মান্যতা এবং অনুপম শ্রদ্ধা চোখে পড়বে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ''মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশি ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না।... কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ওই দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই।''

রবীন্দ্রনাথকে রামায়ণ সম্পর্কিত দু'টি বইয়ে ভূমিকা লিখতে দেখা গেছে। দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' বইয়ের ভূমিকায় তিনি সংস্কৃত রামায়ণ থেকে শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন (পৌষ, ১৩২০)। রবীন্দ্রনাথকে যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'সরল কৃত্তিবাস' অর্থাৎ কৃত্তিবাস-প্রণীত সপ্তকাণ্ড রামায়ণের ভূমিকা লিখতে দেখা গেছে (বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে ১৩১৫ সালে)। যোগীন্দ্রনাথের বইয়ের ভূমিকায় তিনি দুঃখ করে বলছেন, ''এতকাল আমাদের দেশের যে কেহ অক্ষর মাত্র পড়িতে জানিত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামদাসের মহাভারত না পড়িয়া ছাড়িত না, যাহার অক্ষরবোধ ছিল না, সে অন্যের মুখ হইতে শুনিত। এই রামায়ণ, মহাভারত আমাদের সমস্ত জাতির মনের খাদ্য ছিল, এই দুই মহাগ্রন্থই আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজকাল আমরা যাহাকে শিক্ষিত সম্প্রদায় বলি, সেই সমাজে এই দুই গ্রন্থ এখন আর কেহ পড়ে না। অথচ জনসাধারণের মধ্যে এখনও এই দুই গ্রন্থের আদর রহিয়াছে।'' যোগীন্দ্রনাথ বসুর বই সম্পর্কে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে একটি চিঠি লিখেছিলেন (কার্তিক, ১৩৩৫) সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, ''কৃত্তিবাসের রামায়ণ যদি বাঙ্গালি ছেলেমেয়েরা না পড়ে তবে তার চেয়ে শোচনীয় আশঙ্কা আমাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না।''

শিশু কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ দু'ভাবে শিশুকে রামায়ণের সঙ্গে সংপৃক্ত করে দিচ্ছেন, নাম-বাচক শব্দে এবং প্রকৃতি চিত্রণে। কখনো নাম না বলেই শিশু রামায়ণের দেশে পাড়ি দিয়েছে— ''মা গো, আমায় দেনা কেন/একটি ছোটো ভাই—/দুইজনেতে মিলে আমরা/বনে চলে যাই।'' এখানে নাম না করেও শিশু নিজের সঙ্গে শ্রীরামকে অভেদ কল্পনা করেছে, ছোটো ভাইটি যে সহোদর লক্ষ্মণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতি চিত্রণে রামের বনবাস-জীবন শিশুর কল্পনায় মুহূর্তেই চলে আসে— ''চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই/এমনি বরষাতে...''। রাজপুত্রের বনবাসী হয়ে যাওয়া বাঙ্গালি তথা ভারতীয় শিশুর মানস-কল্পনায় কতটা প্রভাব এনেছিল, 'সহজপাঠ'-এর একটি কবিতায় কবি তা এক লহমায় ধরে দিয়েছেন— ''ঐখানে মা পুকুরপাড়ে/জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে/হোথায় হব বনবাসী—/ কেউ কোথাও নেই।/ওইখানে ঝাউতলা জুড়ে বাঁধবো তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,/শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে/থাকব দুজনেই।'' কী বলবেন একে, মিথোম্যানিয়া নয়? রামায়ণ-ম্যানিয়া নয়! পারবেন তো এই শিকড়কে কেটে দিতে! আমার কিন্তু একজন রবীন্দ্রনাথ আছেন। আপনার?

বাঙ্গালি শ্রীরামকৃষ্ণের, স্বামীজীর, রানি রাসমণির শ্রীরাম- সাধনার ধারা বিস্মৃত হয়েছে। একইদেহে রাম আর কৃষ্ণ সুমধুর; একতারাতে দোঁহে বাঁধা। অথচ অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণর পরিচিতির মধ্যে বুধজন যেভাবে তাঁর শ্রীরাম সত্তাকে, শ্রীরাম-সাধনাকে লুক্কায়িত রাখতে চায়, মাঝে মাঝে তা অত্যন্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হয়। কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ তো বলেই বসেন,

বাঙ্গলায় শ্রীরাম-উপাসনা একেবারেই অপ্রচলিত, কোনো একটি রাজনৈতিক দল তার আমদানি ঘটিয়েছে। কিন্তু সত্যিই কী তাই?

১. গদাধরের (শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যনাম) পিতামহ মানিকরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'দেড়ে' গ্রামের এক সদাচারী ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ; দিন কাটতো রঘুবীরের সেবায়। গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম রঘুবীরের পুজো না করে জল পর্যন্ত স্পর্শ করতেন না। জমিদার রামানন্দ রায়ের অত্যাচারে যখন ক্ষুদিরামকে দেড়ে গ্রাম ছেড়ে কামারপুকুর চলে আসতে হলো তখন প্রায় কর্মহীন ক্ষুদিরমের সিংহভাগ কাটতো তার আরাধ্য রঘুবীরকে নিয়ে; রাম-ই তখন তাঁর একমাত্র শান্তি ও প্রাণের আরাম।

২. মানিকরাম-সহ তাঁর বংশের প্রায় সকলের নামের মধ্যে 'রাম' কথাটি যুক্ত হয়েছিল, তা অবশ্যই অচেতনভাবে নয়। মানিকরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র তথা শ্রীরামকৃষ্ণের পিতার নাম 'ক্ষুদিরাম'। মানিকরাম তার অপর দুই পুত্রের নাম রাখলেন 'নিধিরাম' ও 'কানাইরাম', কন্যার নাম 'রামশীলা'। ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রামকুমার', মধ্যমপুত্র 'রামেশ্বর', কানাইরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রামতারক'; রামশীলার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রামচাঁদ'; রামশীলর দৌহিত্র ও দৌহিত্রীদের নাম যথাক্রমে 'রাঘব', 'রামরতন', 'হৃদয়রাম' এবং 'রাজারাম'।

৩. ক্ষুদিরাম এক গ্রীষ্মকালের দুপুরে কাজে বেরিয়েছেন দূর গ্রামে; রৌদ্রতেজে ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত। পথে এক বৃহৎ গাছতলের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়লেন। তখনই দেখলেন এক বিচিত্র স্বপ্ন। এক শ্যামলা ছেলে বায়না করছে তাকে যেন ক্ষুদিরম সঙ্গে নিয়ে যান। ক্ষুদিরামের তখন নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। কিন্তু চিনতে পারেন, সেই শ্যামল সুন্দরকে; এ তো বালক রঘুবীর! তিনি দেবসেবা করবেন কী করে! বালক বলছে, সে তো বিশেষ কিছু চায় না, ক্ষুদিরাম যেভাবে রাখবেন সেভাবেই খুশি থাকবেন। তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। নির্দেশ অনুযায়ী পাশের ধানক্ষেতে গেলেন। মাটির ঢিপির পাশে এক শালগ্রাম শিলা; একটি বিষধর সাপ তার পাশে। সাপ সরে গেলে আনন্দে শিলাখণ্ডটি মাথায় তুলে নিলে ক্ষুদিরাম। চিনতে ভুল হয় না তাঁর! এ যে সত্যিই রঘুবীর শিলা! অতঃপর রঘুবীরই হয়ে উঠলেন ক্ষুদিরামের গৃহের অন্যতম আদরের রামলালা।, শিলাখণ্ডটিকে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ঘটের পাশে স্থাপন করলেন; রাঘব রঘুনন্দনই তাঁদের গৃহদেবতা হলেন।

৪. আনুমানিক ১২৩০ সালে ক্ষুদিরাম রামেশ্বর তীর্থ দর্শনে যান এবং একটি বাণলিঙ্গ নিয়ে ফেরেন। ১২৩২ সালে জন্ম নেয় তার দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর।

৫. শ্রীরামকৃষ্ণের দাদা রামকুমারকে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর সেবার দায়িত্ব তুলে দিলেন রাসমণি। ঘটনাক্রমে এই রাসমণির বাপের বাড়িতেও ছিল রঘুবীর। আর রাসমণি বিয়ের পর অচেনা সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন সুলক্ষণ রামশিলা। বোধহয় রামকুমার ও রাসমণির জীবনে এ এক আশ্চর্য সমাপতন। রাসমণি কী চেয়েছিলেন? শ্রীরামঘরানার কোনো পুরোহিতই আদ্যাশক্তির পুজোর ভার নেবেন? শ্রীরাম যোদ্ধাবতার, ক্ষত্রিয় বীর; মা কালী অসুর-দলনী। দেশপ্রেমী জমিদার গিন্নীর নেপথ্য-ভাবনা কী ছিল বাঙ্গলার মাটিতে শক্তি সাধনার পীঠ তৈরি করা? তাতে সমন্বয় সাধিত হোক রাম আর কালী?

৫. শ্রীম কথামৃতে লিখছেন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দিরে তার প্রথম দিনের দর্শনের কথা, ''এক পার্শ্বে পরহংসদেবের সন্ন্যাসী হতে প্রাপ্ত অষ্টধাতু নির্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহমূর্তি ও বাণেশ্বর শিব।'' তা এই রামলালা ঠাকুর পেলেন কীভাবে?

৬. ১২৭০ সাল, তীর্থযাত্রা পথে বিশ্রাম নিতে কালীবাড়িতে এলেন জটাধারী নামক রামাইত সাধু; নিত্য যার সঙ্গে ধাতুনির্মিত শ্রীরামচন্দ্রের শৈশবমূর্তি থাকে। তার ধ্যানজ্ঞান শ্রীরামকৃষ্ণের নিরন্তর সান্নিধ্য; তার অনুভূতি— শ্যামবর্ণ জ্যোতির্ময় শ্রীরাম নিত্য পুজো নেন তার কাছ থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ খুঁটিয়ে দেখলেন এই সেবক-সাধুর রামপূজন, সাধন-ভজন-আরাধন; আর জটাধারীর প্রতি আকর্ষণ বাড়তে লাগলো। শ্রীরামচন্দ্রের শিশুমূর্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমাকুল হয়ে উঠলেন। তার মনও ধাবিত হলো মায়ের স্নেহের মতো রামলালাকে সেবা করতে দেবশিশুকে কোলে নিতে। ঠাকুরের আগ্রহ দেখে জটাধারী তাকে রামলালার মন্ত্র দিলেন; ঠাকুর মন্ত্র পথে শ্রীরামের অনুসারী হলেন। ঠাকুরের দৈব্য-সেবায় শ্রীরাম ধরা বড়লেন, তিনি দিব্যদর্শন পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মুখে এবার আবির্ভূত হলেন দশরথ তনয় শ্রীরঘুপতিরাম; সাধনায় সিদ্ধ হলেন ঠাকুর। আর এই দিব্যলীলা দর্শন করে জটাধারী শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে গেলেন তার রামলীলা বিগ্রহটি; উপযুক্ত উত্তরাধিকারই বটে!

৪. স্বামীজীর শ্রীরাম-সাধনা ও মহাবীর-ভক্তি : ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি (৭ জানুয়ারি); তখনও নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠেননি। কল্পতরু দিবস অতিবাহিত হয়েছে (১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি); শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাঁর আদরের নরেনকে নিজের কুলদেবতা রামের ইষ্টমন্ত্র দিলেন। নরেনের শ্রীরাম ভজনা শুরু হলো। শ্রীম (মাস্টারমশাই)-র দিনলিপি উদ্ধৃত করে স্বামী প্রভানন্দ লিখেছেন সেই কথা। ১৩ জানুয়ারি শ্রীম দেখছেন, নরেন্দ্রনাথ পাগলের মতো রামনাম গাইছেন; অবশেষে ১৬ জানুয়ারি নরেনকে শ্রীরাম সন্ন্যাসীবেশে দর্শন দিলেন। আর ১৯ জানুয়ারি নরেন্দ্রনাথ-সহ নিরঞ্জন প্রমুখ সেই সন্ন্যাসীবেশী রামের মতো রামাইত সাধুর বেশ ধারণ করলেন। নরেনের গেরুয়াবেশে মা ভুবনেশ্বরী যারপরনাই চিন্তিত হলেন। নরেন যে সপার্ষদ সন্ন্যাসী হতে চান এবং তা ক্ষত্রিয় রামের সন্ন্যাবেশী রূপের তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরাম বনবাসী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষাত্রধর্ম অক্ষুণ্ণই ছিল। শ্রীরামের এই অনন্য রূপের মধ্যেই রয়েছে চিরন্তন ভারতবর্ষের শাশ্বত চিন্তন; শৌর্যশালী অথচ তাপসমালী। ভারতবর্ষের তপোবনে ভারতীয় সভ্যতার অনন্য উপাচার আর নগর-রাজধানে বিক্রমশালী প্রজারঞ্জন রাজা— এ দুয়ের এক অমিত মেলবন্ধন হলো শ্রীরামের সন্ন্যাসরূপ। স্বামী বিবেকানন্দ যে বীর সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছেন তা হয়তো এই রঘুবীরেরই সাধনায়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্যকে কুলের ইষ্টনাম দিয়ে সেই সাধনার ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন, বাঙ্গলাতে শ্রীরাম সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। বাঙ্গলার ধর্মীয় সংস্কৃতিতে শ্রীরামচন্দ্রকে পূজন-আরাধন যে প্রচলিত ছিল তা কবি কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী'ই অমোচ্য প্রমাণ। ■

বসন্তের রোদ্দুরে বিকৃতির গ্লানি

সুজিত রায়

এ কোন সকাল? রাতের চেয়েও অন্ধকার?

সকাল মানেই তো রোদ। রোদ্দুর।

কিন্তু রোদ্দুর রায় মানে? নিকষ কালো আঁধারের চাদর। যে চাদরের নীচে প্রতিদিন একটু একটু করে বিকৃত হচ্ছে বাঙ্গলার কৃষ্টি, বাঙ্গলার সংস্কৃতি, বাঙ্গলার ঐতিহ্য, বাঙ্গলার পরম্পরা। সে আঁধারের প্রভাব এতটাই যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট বসন্তোৎসবে খোদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রামধনু রঙে রঙিন হয়ে লজ্জা-বিবর্জিত যৌবনবতীরা পিঠে 'বাঁ...চাঁদ উঠেছিল গগনে' লিখে ঘুরে বেড়ায় সপাটে রবীন্দ্রনাথের মুখেই থাপ্পড় মেরে। সে আঁধারের প্রভাব এতটাই যে চার নাবালিকা কিশোরী মালদার মতো মফস্সল শহরের খোলা রাস্তায় পাশের বাড়ির কাকুকে নিয়ে বানানো যৌনতার উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দেয় নির্ভয়ে নির্দ্বিধায়। আর ভিজে কাকের মতো চেহারা নিয়ে যে লোকটি (তিনি অবশ্য নিজেকে তরুণ ভাবতেই বেশি আগ্রহী) নিজেই ভাইরাস হয়ে ইউটিউবের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় বিষের আতর, সেই রোদ্দুর রায় ফেসবুকে নিজেকে জাহির করে 'পরিবর্তনকামী সাংস্কৃতিক কর্মী', 'প্রতিবাদী সামাজ সংস্কারক' বলে। ভগবানের মুখোশ পরে চোরের ধর্মকথা শোনানোর নাটক করে। সেই রোদ্দুর রায় হিংস্র দাঁতালের মতো ধ্বংস করে সংস্কৃতির সবুজতাকে, সারল্যকে, নমনীয়তাকে। এমনকী সামাজিকতাকেও— যে সামাজিকতা সেই সরস্বতী সভ্যতা বা তাঁরও আগে থেকে ধরে রেখেছে ভারতীয় সভ্যতাকে।

কে এই রোদ্দুর রায়।

রোদ্দুর রায় কোনো বিশেষ বা বিশিষ্ট ব্যক্তি নন। রোদ্দুর রায় একটি নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক প্রতিষ্ঠান হয়তো বিদেশি মদতপুষ্ট। যে প্রতিষ্ঠানটির কাজ হলো খেউড়কে অস্ত্র করে বাঙ্গলার অপুষ্ট তরুণ- তরুণীদের মানসিক এবং শারীরিক বিপর্যয়ের শিকার করে তোলা। মুঠো মুঠো টাকা রোজগারের ধান্দায় যে প্রতিষ্ঠানটি ইউটিউবকে বাহন করে এবং অবশ্যই এই প্রতিষ্ঠানটি হয় সরকার অথবা কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের বাহুবলে বলীয়ান। অনেকেই বলছেন— রোদ্দুর রায় একটা আস্ত পাগল। এদের মতো লোককে পাত্তা না দেওয়াই ভালো।

ভুল হচ্ছে। লোকটিকে পাগল ভাবলে ভুল হবে। ইনটেলেকচুয়াল ভাবলেও ভুল হবে। রোদ্দুর রায় একজন দক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি

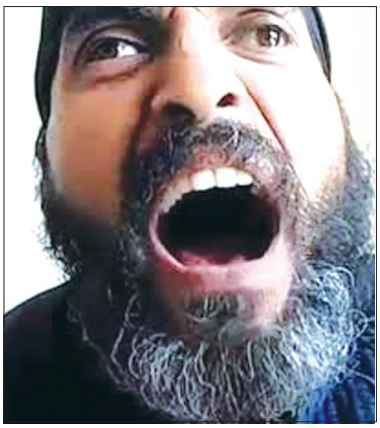

ধ্বংসকারী এজেন্ট বা দালাল। তা নাহলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছ্যাঃ ছ্যাঃ ধ্বনি উঠে যাওয়ার পরও, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক ঐক্য যুক্ত মঞ্চ বেলেঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরেও, এমনকী যাদের ব্যবহার করে অসংস্কৃতির বীজ ছড়িয়ে দিয়েছেন রোদ্দুর, সেই সব তরুণ-তরুণী বা কিশোরীরা প্রকাশ্যে মুচলেখা দিয়ে ছাড়া পেলেও রোদ্দুর রায়ের গায়ে হাত পড়ে না প্রশাসনের। লজ্জায় ঘৃণায় রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য পদত্যাগ করলেও সরকার সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে না। রোদ্দুর রায়কে সোশ্যাল মিডিয়ায় গ্রেপ্তারের দাবির বিরুদ্ধে হুমকি দিলেও সরকার থাকে অবিচল।

মুশকিলের শেষ এখানেই নয়। মুশকিল হলো সমাজের চোখ বুজে থাকা কিছু সাধারণ মানুষ, অতি বোদ্ধা, কিছুই না বুঝে ওঠার মানসিকতা সম্পন্ন কিছু ব্যক্তি এবং সরাসরি রোদ্দুর রায়ের সমর্থকরা যখন বলে ফেলছেন— 'ছ্যাড়ান দ্যান, পোলাপানের কাণ্ড। এমনটা তো হইবই', যখন কেউ কেউ বলছেন, গানের প্যারডি তো চিরকালই হয়ে এসেছে, রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা নিয়ে প্যারডির অভাব নেই, তাহলে রোদ্দুরের অপরাধ কোথায়? তসলিমা নাসরিনের মতো ব্রান্ডেড লেখিকা যখন পরজীবী হয়েও দাবি তোলেন, কে বলেছে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হাস্যরস করা যাবে না? কেউ বলছেন, সমাজ বদলে যাচ্ছে, তাহলে ভাষাই বা বদলাবে না কেন? তসলিমা তাঁর 'মেয়েবেলা'-র স্বরেই খোলামেলা প্রশ্ন তুলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের যুগে ছোটরা বড়োদের চোখে তাকিয়ে কথা বলত না, এখন ছোটোরা বাপকেও বলে দেয়— ফাক, হোয়াট আ বুলশিট। এসবকে যদি আমরা আধুনিকতা, স্মার্টনেস বলি, তবে মেয়েদের পিঠে হাস্যরসের জন্য লেখা বাঁ... চাঁদ উঠেছে গগনে দেখলে আমরা আঁতকে উঠি কেন? কে বলেছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হাস্যরস করা যাবে না? ভগবানকে নিয়ে করা যায়, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে করা যাবে না কেন?'

না, আমরা কোনো যুক্তিকেই এড়িয়ে যেতে চাই না। বরং অন্ধত্বকে দূর করার জন্য দুটো কথা বলতে চাই। ওইসব অন্ধদের হাজার সমালোচনার ঝড়ের মুখেও যাঁরা বলছেন, 'পোলাপানের কাণ্ড' (অনেকটা ওই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন একটি ধর্ষণের ঘটনাকে 'বাচ্চা ছেলের কাণ্ড' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন) তাঁরা শুনে রাখুন— ওই পোলাপান একদিন আপনার ঘরেও বেড়ে উঠবে। আজ যে গান গাইছে, দুদিন পরে সে ধর্ষক হয়ে উঠবে। আজ সে পিঠে খিস্তি লিখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদিন বাদে সেই-ই আপনার বাড়ি ফিরবে মাঝরাতে। সহ্য করতে পারবেন তো?

যারা বলছেন, গানের প্যারডি তো হতেই পারে, তারা জেনে রাখুন রোদ্দুর রায় যা করেছেন তা প্যারডি নয়, বারলেস্ক। প্যারডি হলো নিছক মজা করার জন্য শুদ্ধ ভাষায় ব্যঙ্গ

করা। আর বারলেস্ক হলো— ...a literary, dramatic or musical work intended to cause langhter by caricatering the manner of sprit of serious works or by ludicrous treatment of their subjects. অর্থাৎ রোদ্দুর রায় রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে প্যারডি রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি প্যারডি রচনা করতে গিয়ে যে ভাবে অপরিমিত আক্রমণ হেনেছেন খিস্তি এবং খেউড় দিয়ে তা হাংরি জেনারেশন বা অ্যাংরি জেনারেশনের সাহিত্যকেও হার মানায়।

কেউ কেউ বলেছেন, বাঙ্গালির সংস্কৃতি মানেই কি রবীন্দ্রনাথ? নাকি রবীন্দ্রনাথকে গালাগাল দিলেই বাঙ্গলার সংস্কৃতি শেষ।

আমি বলব— হ্যাঁ ঠিক তাই। মহাত্মা গান্ধী যেমন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আইকন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির আইকন। রবীন্দ্রনাথকে ধুয়ে মুছে শেষ করার চেষ্টা করার মানে বাঙ্গলার সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেওয়া।

অস্বীকার করব না, রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকে ভালোবাসাটা বাঙ্গালি সমাজের একাংশের কাছে পণ্য। তাই আরও একটা রবীন্দ্রনাথ জন্ম নেন না। কিন্তু একথাও অস্বীকার করব না, ওই একাংশটা আয়তনে এতটাই ক্ষুদ্র যে তা মলিকিউলার ফার্মেই অবস্থান করে। চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ মাখামাখি হয়ে আছেন বাঙ্গলার চিন্তায়, ভাবনায়। মননে, চিন্তনে। চরম গ্রীষ্মে, ভরা বর্ষায় অথবা গভীর শীতের আবেষ্টনেও।

রোদ্দুর রায়ও রবীন্দ্রনাথকে পণ্য হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর মননে চিন্তনে পরিশুদ্ধভাবে অবস্থান করছেন না রবীন্দ্রনাথ। সোজা কথা— এতকাল কিছু মানুষ শুদ্ধতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যবসা করেছেন। রোদ্দুর রায় সেই শুদ্ধতার মুখে থাপ্পড় মেরে অশ্লীলতার মোড়কে রবীন্দ্রনাথকে বন্দি করে 'বেওসা' করতে নেমেছেন। এ ধরনের 'প্রতিভা'কে মাথায় তোলা যতটা অন্যায় ঠিক ততটাই অন্যায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। কারণ রোদ্দুর রায় মানে বিষ। বিষাক্ত ভাইরাস। রোদ্দুর রায়রা সংগোপনে বেড়ে ওঠে। তারপর ছড়াতে থাকে সমাজের পরতে পরতে। এদের মুখ থাকে না। থাকে মুখোশ, যে মুখোশের মুখ দিয়ে মানবতার বাণী ঝরে ফুটপাতবাসীর জন্য, ধর্ষিতা নারীর জন্য, অর্থের অভাবে শিক্ষায় অপুষ্ট নারী পুরুষের জন্য। অথচ ওই মুখোশই ফুটপাতবাসীকে ঘরের সন্ধান দিতে আগ্রহী নয়, ধর্ষিতা নারীকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা না দিয়ে আরও পাঁচটা নারীকে ঠেলে দেয় যৌনতা সর্বস্ব পৃথিবীর দিকে। শিক্ষার আলোয় অশিক্ষিত নারী পুরুষকে আলোকিত না করে সমাজের শিক্ষিত সমাজকেই অশিক্ষিত করে তোলে। আর বাঙ্গালির সর্বংসহা মনোভাবকে পুঁজি করে দুর্বলতা বেচে রোজগার করে চলেন অবলীলায়।

আমার মনে পড়ছে, হাংরি জেনারেশন যুগে বাংলা সাহিত্যের জগতে কফি হাউস সর্বস্ব হাংরি জেনারেশনের রমরমার সময়ে একটা স্লোগান উঠেছিল— 'ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো'। ওইসব সাহিত্যিকরা বলতেন— রবীন্দ্রনাথের মতো আগাছা সর্বত্রই গজাতে পারে। ছাঁচ ভাঙতে গিয়ে নিজেরাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছেন। সাহিত্যপ্রেমীরা তাঁদের কাজ তো দূরের কথা, নামও মনে রাখেনি। রোদ্দুর রায়ও সাময়িক। তফাত একটাই— হাংরি জেনারেশন বা অ্যাংরি জেনারেশন সত্যিই কিছু পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন সাহিত্যকে ভালোবেসে। এরা কেউ মূর্খ ছিলেন না। বদমাইশ তো ননই। রোদ্দুর রায় মূর্খ এবং বদমাইশ। যাঁরা বলছেন, রোদ্দুর রায় এক্সপ্লোরেটর বা আবিষ্কারক, যাঁরা তাঁকে বিদ্যাসাগর, রামমোহন কিংবা ডিরোজিওর মতো সমাজ সংস্কারের অবতার হিসেবে সম্মান দিতে চাইছেন, তারা আরও বেশি মূর্খ। আরও বেশি বদমাইশ। কারণ তাঁরা রোদ্দুর রায়কে ব্যবহার করছেন সমাজকে ধ্বংস করার জন্য। সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য। সেই সঙ্গে 'বেওসা' করে দু'পয়সা রোজগারের জন্য। এঁদের মধ্যে আছেন নব্য স্বাধীনচেতা বামপন্থীরা। আছেন মানবতাবাদীরা। আছেন মানবাধিকারবাদীরাও। এঁরা সমাজের Change Agent বা পরিবর্তন প্রতিভূর পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেও আসলে এঁরা যে পরিবর্তন আনতে চাইছেন, তা পশ্চিমবঙ্গের ২০১১ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের মতোই নেতিবাচক পরিবর্তন অথবা এখন বামপন্থীরা সামাজিক জনবিন্যাসে যে পরিবর্তন আনতে চাইছেন, সেই পরিবর্তনের মতো।

রোদ্দুর রায় এদেরই প্রতিভূ। ইনি হাস্যরস আর খিস্তিখেউড়ের তফাত বোঝেন না কিংবা বুঝতে চান না। তাই সগর্বে খিস্তির সুরে বলেছেন, তিনি নাকি আর্ট আন্দোলন করছেন। বাংলাপ্রেমী শিল্পী 'বাঙ্গলা' রক্ষায় নেমেছে— ওই 'বাঙ্গলার ত্রাতা' গর্গ চ্যাটার্জি কিংবা বামপন্থী শতরূপ ঘোষের মতো যারা রোদ্দুর রায়ের কাগের ঠ্যাঙ বগের ঠ্যাঙ কবিতার বইয়ের উদ্বোধনে হাজির ছিলেন সগর্বে। রোদ্দুর রায় ওই গর্গদের গর্তেই বসবাসকারী এক বিজাতীয় মানুষ। না, কোনও প্রতিষ্ঠান নয়। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সভ্যতা নয়। রোদ্দুর রায় যদি প্রতিষ্ঠান হন তাহলে গোটা পরিবেশটারই ভারসাম্য ভেঙে পড়বে। ভুলে যাবেন না, যে রবীন্দ্রনাথকে খিল্লি করে উনি আজ ইউটিউব থেকে মাসে লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করছেন, সেই রবীন্দ্রনাথই ওনার মূলধন। অর্থাৎ তোমার খাব— তোমারই ক্ষেতে চোরকাঁটার বীজ ছড়াব। এরা তাই নর্দমার কীট ছাড়া কিছুই নয়। এখনও যাঁরা স্রেফ মজার জন্য রোদ্দুর রায়ের গান শুনছেন, এখনও যাঁরা সমর্থন জোগাচ্ছেন তাঁদের অনুরোধ করব— সাবধান হয়ে যান। চন্দ্রবোড়ার বিষ খুব ধীরে ধীরে শরীরে ছড়ায়। কিন্তু যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন আর কিছু করার থাকে না। মৃত্যু হয়ে ওঠে অনিবার্য পরিণতি। অথবা সারাজীবনের মতো পঙ্গুত্ব হয়ে ওঠে শরীরের অলংকার।

আপনি যদি নেতিবাচক মানসিকতার মানুষও হয়ে থাকেন, বলব— নিজেকে পরিবর্তন করুন। সনাতনী ঐতিহ্যের সঙ্গে থেকে সুস্থতার সন্ধানে নামুন। পরিবর্তন— সে তো সব সময়েই কাম্য। কিন্তু নিশ্চয়ই তা দেশ, সমাজ, মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য নয়। দুঃস্বপ্নের অন্ধকারময় রাত্রির ঘাম মেখে জেগে থাকার জন্য নয়। পরিবর্তন আসুক খাঁটি সোনার মতো রৌদ্রকিরণে। ভেজা কাকের মতো রোদ্দুর রায়ের বিকৃত ঢঙে নয়। ■

করোনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণ সংশয়কারী হবে না

ডাঃ দেবাশিস বসু

করোনা ভাইরাস আগেও ছিল— নানা সময়ে নানা রোগ সৃষ্টি করেছে। সময় সময় সার্স-এর মতো বিপজ্জনক রোগও সৃষ্টি করেছে। করোনা ভাইরাসের নবতম সংস্করণ (Novel Coronavirus বা n CoV) দেখা দিল চীনের উহান অঞ্চলে ২০১৯-এর শেষ লগ্নে। এই ভাইরাসজনিত রোগের নাম COVID-19 (অর্থাৎ Corona virus disease-19)। COVID-19 আড়াই মাসের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছে সারা পৃথিবীতে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। এই রোগের নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ নেই। প্রতিষেধক তৈরির সময় মেলেনি। শ্বাসনালীতে এর সংক্রমণ কাশি, জ্বর থেকে শুরু করে জীবন সংশয়কারী ফুসফুসে নিমোনিয়া সৃষ্টি করতে পারে। সংক্রমণের ভয়ে এবং সংক্রমণ রোধের ব্যবস্থাগুলির ফলশ্রুতিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মহামারী একটি পরিচিত শব্দ, যাকে বলে epidemic। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা COVID-19-কে ঘোষণা করেছে pandemic বলে, যার সাধারণ প্রতিশব্দ নেই। না থাকার কারণ হলো যে pandemic একটি বিরল ঘটনা। আগে ঘটেনি এমন নয়, তবে সচরাচর ঘটে না। Pandemic অর্থের তাৎপর্য হলো যে রোগ কোনো ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই, তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। COVID-19 পৌঁছে গেছে এনটার্টিকা বাদে প্রতিটি মহাদেশে।

সমসাময়িক কালের জীবনযাত্রায় যাতায়াতের দ্রুততা ও সহজলভ্যতা এবং পর্যটনের ব্যাপক প্রসার এক বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কোনো এলাকায় কোনো রোগ দেখা দিলে তা অতি সহজে ও স্বল্প সময়ে অনেক দূর দেশে পৌঁছতে পারে। আগে কোনো এলাকায় মহামারী হলে তা সেই এলাকায় আবদ্ধ থাকত। মানুষের আনাগোনা নিয়ন্ত্রণ করলে রোগ ছড়াবার সম্ভাবনা কম থাকত। সময় দিলে প্রকৃতির

নিয়মে, ঋতুর পরিবর্তনে এবং চিকিৎসায় মহামারী প্রশমিত হতো। এবার কিন্তু মূলত পর্যটকদের মাধ্যমে COVID-19 ছড়িয়েছে। ভারতেও ঢুকেছে ওই ভাবে।

যত ব্যাপকই হোক না কেন, একটি আশ্বাসের কথা অবশ্যই শুনিয়ে রাখা ভালো। কোনো ব্যক্তির শরীরে সংক্রমণ তখনই সম্ভব যখন তিনি এমন ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন যাঁর শরীরে ভাইরাস রয়েছে। এবং তাঁর শরীর থেকে ভাইরাস হাঁচি, কাশির মাধ্যমে নির্গত হচ্ছে। নচেৎ সংক্রমণ হবে না।

ওই ভাইরাস বাহক ব্যক্তিটিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সমস্যা হলো যে ওই ভাইরাস-বাহক আপাতদৃষ্টিতে অসুস্থ নাও হতে পারেন। তাঁর কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট বা রোগের অন্যান্য অভিব্যক্তি দেখা দেবার আগে থেকেই তাঁর শরীর থেকে ভাইরাস নির্গত হচ্ছে। তাঁর অজ্ঞাতেই তিনি ভাইরাস ছড়াচ্ছেন এবং নিজের অজানতেই সুস্থ ব্যক্তি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে।

শরীরে ভাইরাস ইতিমধ্যেই আছে, তা রোগের লক্ষণগুলি দেখা দিয়ে থাক বা নাই দিয়ে থাক, এমন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা সব থেকে জরুরি। এর জন্য ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা প্রয়োজন। সন্দেহজনক যে কোনো ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিদেশ থেকে ফিরছেন এমন ব্যক্তিদের বিশেষ করে পরীক্ষা করা দরকার। সময়ে পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা না পড়লে সেই ভাইরাস বহনকারী ব্যক্তি দেশের মধ্যে সর্বসাধারণের মধ্যে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটাবেন। বিপত্তি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে যদি দেশের অভ্যন্তরে সংক্রমিত হয়েছেন এমন ব্যক্তি থেকে স্থানীয় এলাকার আরও অনেক সুস্থ মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ঘটতে সুরু করে।

এই পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না হয় তার জন্যই ভিড় ও জমায়েতের ওপর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। সাক্ষাতে সংক্রমণ কমাবার জন্য ব্যক্তিগত স্তরে অবশ্য কর্তব্যগুলি স্মরণ করাবার জন্য চলেছে এত প্রচার। সেই আদেশ-উপদেশ মেনে চলা একান্ত জরুরি। রোগের সংক্রমণ রোধে সরকারি ব্যবস্থার পাশাপাশি ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন না করলে সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে না।

ভাইরাস ঢুকবে নাম-মুখ দিয়ে। তার লক্ষ্য শ্বাসনালী মারফত ফুসফুস। বাতাস বাহিত কণা (droplet) দিয়ে ভাইরাস ছড়ায়। সামনে কেউ নাক, মুখ না ঢেকে হাঁচলে, কাশলে কণা সহজেই অন্যের নাক, মুখ অবধি পৌঁছাতে পারে। এমনকী হাতের তালুতে বা আঙুলেও কণা হাতে চলে আসতে পারে। সেই (অপরিষ্কার) হাত নাক, মুখ, চোখে দিলে সংক্রমণ ঘটতে পারে। তাই ঠিক মতো হাত ধোয়ার বিষয়টি এতে গুরুত্বপূর্ণ। একটি আশ্বাসের কথা। আক্রান্ত ব্যক্তির অসুস্থতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণ সংশয়কারী হবে না। মৃত্যুর হার মোটামুটি ৩ থেকে ৫ শতাংশ। অনেক সংক্রামক ব্যাধিতে এবং ইতিহাসের বহু মহামারীতে মৃত্যুর হার এর থেকে অনেক বেশি ছিল।

জ্বর, কাশি নানা জীবাণু থেকে হয়। জ্বর, কাশি হলেই তা করোনা ভাইরাসজনিত নয়। ভীত হবার কারণ নেই। তবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সরকারের স্বাস্থ্যবিধি ও আচরণবিধি মেনে চলতেই হবে।

(লেখক প্রখ্যাত জীবাণু সংক্রমণ বিশেষজ্ঞ)

গাছের গোড়ায় জল তো দিন

দিল্লিতে আক্রান্ত হিন্দুদের কিছু মর্মান্তিক দৃশ্য। যা সমস্ত হিন্দুদের উপর ঘটতে চলেছে। হিন্দুরা ঘুমাচ্ছে আর জেগে উঠে ভাবছে আমার উপরে তো আক্রমণ হয়নি আর আমার বাড়ির সব মা বোনেরা ঠিকঠাক আছে। ওই দিল্লিতে যা হচ্ছে তাতে আমাদের হিন্দুদের কোনো চাপ নেই। এটাই সত্যি, সমস্ত হিন্দুরা এটাই ভাবছে এখন। কিন্তু মুসলমানরা কিন্তু হিন্দুদের মেপে নিচ্ছে কতটা হিন্দুরা সহ্য করতে পারে তার পরে আপনার পালা। কী ভাবছেন বাড়ির আশেপাশে মুসলমান নেই, কোনো চাপ নেই। ভুল ভাবছেন। কেন? ধরুন বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে তাই প্রচুর গাছ (হিন্দু ঐক্য) লাগানো দরকার। এবার আসি দিল্লির বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (মুসলমান আক্রমণ) পরিমাণ সব থেকে বেশি। আপনি ভাবছেন ওখানের বাতাসে CO_2 বেশি তো পশ্চিমবঙ্গের কি আসে যায় মানে আমাদের বাতাসে তো CO_2 কম কোনো চাপ নেই। দিল্লিতে CO_2 বেশি তাহলে দিল্লিবাসী বেশি গাছ (হিন্দু ঐক্য) লাগাক তাহলে ভালো, নাহলে ওরা মরবে মরুক।

আসল মজাটা ওখানেই ওটা বোঝার সমস্যা। বলি কি দাদা দিল্লিটা তো আর ভারতের বাইরে নয়, পৃথিবীর বাইরে নয়। তাই দিল্লিতে যদি CO_2 বাতাসে বেড়ে যায় তাহলে ধীরে ধীরে বাতাসে CO_2 বাড়তে বাড়তে পুরো বাতাস দূষিত হয়ে যাবে। তারপর বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন (মুসলমান রাষ্ট্র) হবে। তখন যত খুশি গাছ (হিন্দু ঐক্য) লাগান না কেন কোনো কাজে আসবে না। এখন দিল্লির বাতাসে সমস্যা সমাধান হয়ে যান বেশি করে গাছ লাগান সব কিছু ভুলে বিশেষ করে আপনার পরিবারের ছোটো বাচ্চার এবং আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে। প্রতিটি হিন্দুকে গাছ লাগাতে হবে ভবিষ্যতের ফল পাওয়ার জন্য। আর ঘুমাবেন না, অনেক ঘুমিয়েছেন। জাগুন দাদা জাগুন আরো সবাইকে জাগান রাজনীতি-ফাজনীতি দূরে সরিয়ে। ও দাদা কী বললাম শুনেছেন নাকি বার্তাটা শুধু পড়লেন অনুধাবন করলেন না। আরএসএস এবং হিন্দু সংগঠনগুলি এই গাছ লাগানোর কাজ (হিন্দু ঐক্য) করে যাচ্ছে। আপনারা এবার বেরিয়ে আসুন অনেক হয়েছে ওরা আর কত করবে। আপনারা সঙ্গ না দিলে গাছ যে মরে যাবে। অন্তত গাছ না লাগাতে পারেন গাছের গোড়ায় একটু জল, সার তো দিন তাতেই গাছে যা ফল হবে আমার আপনার ১৪ নয় ২৮ পুরুষ বসে বসে নিশ্চিন্তে ফল খাবে দূষণমুক্ত বাতসে।

—**বিবেকনন্দ অধিকারী,**
শিলিন্দা, চাকদহ, নদীয়া।

লালদুর্গে গেরুয়া হানা

প্রথম কোনো নির্বাচনী যুদ্ধে নেমেই সাফল্য লাভ। আর সেই সাফল্য পেল জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। লালদুর্গ নামে পরিচিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এবিভিপি এবারই প্রথম অংশগ্রহণ করে শুধু জয়ই পেল না, গড়ল ইতিহাসও। কারণ ঐতিহ্যবাহী এই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয়তা বিরোধী বামেদের 'ঘুঘুর বাসা'ই তারা শুধু ভাঙতে সফল হলো না, একচেটিয়া বাম আধিপত্যের দুর্গেও ধরাল ফাটল। এবিভিপি ছাত্র সংসদ দখল করতে না পারলেও এ রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক আবহে তদের জয় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ও আলোচিত। উল্লেখ্য, এবিভিপি ভারতে সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন।

চমকপ্রদ ঘটনা হচ্ছে, নির্বাচনী যুদ্ধে এবিভিপি কলা বিভাগে ২টি আসনে জয়ী হয়েছে। আগে এ দুটি আসন ছিল এসএফআই (সিপিএমের ছাত্র সংগঠন)-এর দখলে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে নকশালপন্থী ডিএসএফ জয়ী হয়ে নিজেদের জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেও দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে এবিভিপি। প্রাপ্ত ভোট ৫০৮। এসএফআই পেয়েছে ২৬৫ ভোট। স্থান তৃতীয়। আরটিএমসিপি (তৃণমূল) মাত্র ৭৬

ভোট পেয়ে চতুর্থ হয়েছে। ৩টি এজিএস পদে ডিএসএফ জিতলেও, ২টিতে এবিভিপি দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে এবিভিপি লড়েনি। কিন্তু এই বিভাগে জয়ী হয়েছে নির্দল (ডব্লুউটিআই) প্রার্থীরা। এখানে তারা ১০১৩, এসএফআই ২১৬ এবং ডি এসও (এসইউসি) ৩০ ভোট পেলেও টিএমসিপি পেয়েছে মাত্র ৮ ভোট। এবিভিপি এই বিভাগে লড়লে ফল অন্যরূপ হতো।

তাই উপরি-উক্ত ফলাফল এটাই প্রমাণ করে যে, শাসক দলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি (তৃণমূল ছাত্র পরিষদ) বিলুপ্তির পথে। নির্বাচন ছিল শান্তিপূর্ণ। সেই কারণে টিএমসিপি-র এই করুণ দশা। তাই ভোটলুট না হলে আগামী যে কোনো নির্বাচনে তৃণমূলের গো-হারা নিশ্চিত। সত্যি বলতে, শাসকদলের পায়ের তলার মাটি বহু আগেই সরে গেছে। অগণতান্ত্রিক ভাবে ক্ষমতা দখল করা কোনো স্বৈরাচারি বা জনবিরোধী সরকার কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ইতিহাস তাই বলে। আর তাইতো হিটলার, মুসোলিনি, পলপট, হোনেকার, চেসেস্কু, ইদি আমিন, সাদ্দাম হোসেন প্রমুখের একনায়কতান্ত্রিক সরকার জনরোষে বিলুপ্ত হয়েছে। এ রাজ্যের দুর্নীতিবাজ, তোলাবাজ, দাঙ্গাবাজ, খুনোখুনি, অসহিষ্ণু, ক্ষমতালোভী, হিন্দু বিদ্বেষী, মুসলমান তোষণকারী, মিথ্যে কেস দিয়ে বিরোধীদের জেল-হাজত খাটানো, পুলিশ প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করা গণতন্ত্র হত্যাকারী তথা স্বৈরাচারি তৃণমূল সরকারের পতনও আসন্ন।

যাদবপুর বিশ্বাবিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ছাত্র সংসদ নির্বাচনে টিএমসিপি-র শোচনীয় পরাজয় সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের সুবজসাথী, কন্যাশ্রী ইত্যাদির ন্যায়

প্রকল্পগুলির কোনো ইতিবাচক প্রভাবই পড়েনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে টিএমসিপি-র উপর। তবে কী 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'! সত্যি বলতে কী, তৃণমূলের অপশাসনে বীতশ্রদ্ধ তৃণমূলপন্থী ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড়ো অংশ তৃণমূল ত্যাগ করে গেরুয়া শিবিরে ভিড়েছে। বামপন্থীদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কারণ ৩৪ বছরের বাম অপশাসনের অভিঘাতে বিধ্বস্ত বামপন্থার ক্ষয়রোগ অব্যাহত।

বিগত নির্বাচনগুলিতে মিলেছে তার প্রমাণ। আর শত বর্ষের পুরানো কংগ্রেস? সে নিয়েছে এ রাজ্যে ভূমিশয্যা। সুদীর্ঘ কালের পরস্পরের রাজনৈতিক শত্রু কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ধরেছে একে অন্যের হাত, মতাদর্শ বেমালুম ভুলে। নির্লজ্জ ও ভণ্ড আর কাকে বলে? তাই বহু বাম ও কংগ্রেসি নীতিহীন ও ক্ষমতালোভী স্ব স্ব দল ত্যাগ করে গায়ে মেখেছে গেরুয়া রঙ। আর তারও প্রমাণ মিলেছে উক্ত নির্বাচনে। লাল রঙ ফিকে হয়ে ধারণ করেছে গেরুয়া। আসলে এটাই তো হওয়ার ছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার পর। ষড়যন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হিন্দুত্ববাদ এতকাল পরে তাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ভারতবর্ষে, যাকে অস্বীকার ও অবদমিত করা আর সম্ভব নয়। সেকুলারবাদের নামে নির্ভেজাল মুসলমান তোষণ এখন ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে সেকুলারবাদীদের দিকে। তাঁদের মনে রাখা উচিত, সংখ্যাগুরু নাগরিকদের চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা ও দাবিকে উপেক্ষা ও অবদমিত করে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছা ও দাবিকে মান্যতা দিয়ে বা তোষণ করে কোনো দেশের কোনো সরকার বেশিদিন টেকেনি। এরাজ্যেও টিকবে না। এদেশের সংখ্যালঘু তোষণকারী বাম-কংগ্রেসের অবক্ষয় এবং বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের কাছে স্বৈরতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পরাজয় তারই প্রমাণ। গণতন্ত্রে জনতাই বলে শেষ কথা। তাই তার কণ্ঠরোধ ব্যুমেরাং হতে বাধ্য।

ইতিপূর্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও পরিবেশ বারবার কলঙ্কিত ও দূষিত করেছে বাম ছাত্র-ছাত্রীরা। হয়েছে 'কলরব', প্রকাশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চুম্বন ইত্যাদি নোংরামি। আন্দোলনের নাম ক্যাম্পাস দাপিয়েছে বাম ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের সাগরেদ দেশদ্রোহী 'আজাদি'-'টুকরে গ্যাং'-এর পাণ্ডারা। আক্রান্ত হয়েছেন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যপাল। নির্বাচনী প্রচার করিয়েছে দিল্লির ঐশীকে দিয়েও। তবুও হয়নি শেষ রক্ষা বাম ছাত্র সংগঠনটির। বিধি যে বাম!

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

সত্যিই কি বাঙ্গলার গর্ব?

বর্তমান রাজনীতিতে 'বাঙ্গলার গর্ব মমতা' প্রসঙ্গিক প্রণিধানযোগ্য সত্য ও সত্যান্বেষী কিনা সে বিষয়ে বাক্যটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশিষ্টজন বাক্যটিকে লজ্জার বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দকে অসম্মান করা হয়েছে। আমরা অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখলে দেখব ভারত দ্বিজাতি তত্ত্বে দ্বিখণ্ডিত ভাবে ভাগের সময় সমগ্র বাঙ্গলাকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা থেকে পশ্চিমবঙ্গকে যিনি ভারত ভুক্ত করেছেন, সেই মহান ব্যক্তি ড. শ্যামাপ্রসাদকেও অসম্মান করেছেন।

বর্তমানে 'বাঙ্গলার গর্ব মমতা' বাক্যটিরও অর্থ ও সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং উলটো দিকটাই সহজে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনে মোদীকে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' টিভির পর্দায় হাফ ভারতীয় রাহুল গান্ধীর ছবি, মোদীকে থাপ্পড়, কোমরে দড়ি লাগাতে চাওয়া ইত্যাদি গণতন্ত্রকে কর্দমাক্ত করেছে। অন্যদিকে বাঙ্গলায় সারদা, নারদা, রোজভ্যালিতে যারা দিশা হারা তারা সে অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখবে, ভাবতে পারছে না।

আবার বাঙ্গলার মানুষের মনে সিঙ্গুর আজ বড়ো বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিঙ্গুর জনকোলাহলে পূর্ণ না হয়ে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে ভারত দর্শনের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ দিক রামায়ণ- মহাভারতে নারীর মর্যাদা, যা বিশ্বমানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বাঙ্গলায় যখন নারী ধর্ষণ বৃদ্ধিতে বঙ্গবাসী ব্যথিত ও চিন্তিত হয়ে প্রমাদ গুনছেন, সে সময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বললেন, নারী ধর্ষণের ক্ষতি পূরণ দেওয়া হবে। এ বাণী শুনে আরও ব্যথিত হতে হলো। কারণ আর্থিক সহযোগিতা ধর্ষণের ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। এটি সনাতন সংস্কৃতিতে একটি আঘাত বলা চলে।

বর্তমান রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের সনাতন ধর্মকেই আঘাত হানছে। গত ২০ জানুয়ারি হাড়োয়ার আদর্শ বিদ্যাপীঠে আট বছর থেকে সরস্বতী পূজা বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা পথ অবরোধ করছিল, কিন্তু দেখা গেল সন্ধ্যায় কিছু দুষ্কৃতী এসে পনেরোটি বাড়ি অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়ে গেল। কলকাতা বই মেলায় গীতা পদদলিত করা হলো।

ভারতের তিন-চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পড়ুয়া পাকিস্তান জিন্দাবাদ, দেশকে টুকরো টুকরো করার অর্থাৎ আরও ভাগের স্লোগান দিচ্ছে, বিরোধী নেতৃত্ব বলছেন এটাই গণতন্ত্র, পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মকেই আঘাত হানছে।

খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে রাজনৈতিক বা পারিবারিক কারণে হত্যাকাণ্ড। দিদিকে বলো, কাটমানি প্রকল্প কোনোটিই সুফল দিচ্ছে না। হিংসা ও লোভে মত্ত কিছু মানুষের দর্শন হয়ে উঠছে। 'টাকাই আমার পিতা-মাতা, টাকাই আমার দিদি, টাকা ছাড়া এ জগতে আর কিছু না চিনি।'

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবের হাট, রাশিভাঙা,
কোচবিহার।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বৈজ্ঞানিক অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের জীবন আজও সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

বাঙ্গালি বৈজ্ঞানিক অসীমা চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহিলা, যিনি তৎকালীন পুরুষ সহযোগীদের সঙ্গে সমান দক্ষতায়, কখনওবা তাঁদের থেকেও বেশি প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। পুরুষপ্রধান কর্মক্ষেত্রে তিনি সসম্মানে সাফল্যের সঙ্গে নিজের কাজ করেছেন। অসীমা চট্টোপাধ্যায় ভারতের প্রথম মহিলা, যিনি বিজ্ঞানের ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর বাবা ছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। মা কমলা দেবী। ১৯১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও পড়াশুনার ক্ষেত্রে তাঁর মা-বাবা সর্বদা তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন।

ছোটোবেলা থেকেই তিনি পড়াশুনায় খুব ভালো ছিলেন। ১৯৩২ সালে বেথুন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তৎকালীন যুগে মহিলাদের পড়াশুনা করা সবসময় উৎসাহ পেত না, সেজন্য তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সম্মান জানিয়ে তাঁকে একটি বিশেষ ফেলোশিপ দেওয়া হয়। আইএসসি পাশ করে তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। রসায়ন ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। এক্ষেত্রে বাড়ির সদস্যরা তাঁর এই বিষয় নির্বাচনকে ভালো চোখে দেখেননি। কারণ কলেজে তাঁকে পুরুষ সহপাঠীদের সঙ্গে পড়াশুনা করতে হতো। কিন্তু অসীমার মধ্যে এই নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। তিনি কেবলমাত্র তাঁর পড়াশুনাতেই একাগ্রচিত্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে ডিসটিংশন নিয়ে তিনি বি.এস.সি. পাশ করেন এবং বাসন্তীদেবী স্বর্ণপদক পান। রসায়ন নিয়ে পড়াশুনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট তিনি। এরপর এম.এস.সি পড়ার জন্য তিনি রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তেরো জনের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ছাত্রী।

উদ্ভিদবিদ্যার প্রতিও তাঁর অসীম কৌতূহল ছিল, যা তিনি তাঁর বাবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভেষজের ওপরেও কাজ করেছেন। দেশীয় গাছপালার গুণাবলি থেকে ওষুধ বানাবার কাজে উৎসাহী ছিলেন। প্রাকৃতিক উৎপাদক থেকে ওষুধ তৈরির জন্য গবেষণা শুরু করেন প্রফুল্ল কুমার বোসের কাছে। এক্ষেত্রে তিনি জৈব রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যার ব্যাপারে বিশেষ পড়াশুনা করেন। তাঁর এই গবেষণা মৃগীরোগের ওষুধ আয়ুস-৫৬ এবং ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধকারী বিভিন্ন ওষুধ নির্মাণের পথ প্রদর্শক।

১৯৬১ সালে তিনি শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার এবং ১৯৭৫ সালে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর সাড়ে তিনশোটি গবেষণাপত্র জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হওয়া 'ভারতীয় বনৌষধির' ছয়টি পর্বের তিনি এডিটিং এবং পরিমার্জনা করেন। ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হওয়া 'The Treatise of Indian Medicinal Plants'-এর এডিটরও তিনি। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অনুরোধে তিনি 'সরল মাধ্যমিক রসায়ন' বইটি মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলায় লেখেন। সতেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুর পর ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত অসীমা চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দায়িত্ব নেন। তাঁর কর্মকাণ্ড তৎকালীন মহিলাদের জন্য খুবই উৎসাহবর্ধক ছিল।

একজন মহিলা তৎকালীন গোঁড়া সমাজে বসবাস করেও পড়াশুনার ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিকূল পরিবেশেও তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর সাফল্য আমাদের নানা ভাবে লাভান্বিত করেছে। একজন গবেষক, লেখিকা, এডিটর বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারিণী অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিজ্ঞান চিরকাল ঋণী থাকবে।

তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং দৃঢ় সংকল্প তাঁকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁর অবদান এবং জীবনযাত্রা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। আমরা আজকের মহিলারা অনেক কিছু শিখতে পারি তাঁর থেকে। ■

ক্যান্সার প্রতিরোধে পেঁপের ল্যাটেক্স বিশেষ কার্যকরী

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

পেঁপে পাকা হলে অনেকেই খায় কিন্তু কাঁচা পেঁপে অনেকেই খেতে চায় না। পেট সংক্রান্ত রোগে যারা ভুগছেন তাদেরই বেশি কাঁচা পেঁপে খেতে দেখা যায়। যারা পেঁপে খেতে চান না তারা জেনে রাখুন পেঁপে ক্যান্সার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। বিশেষ করে স্তন, পাকস্থলী, বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার রোধ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচা পেঁপেতে শক্তি থাকে ২৬ ক্যালরি, জল ৯২ গ্রাম, প্রোটিন ১ গ্রাম, ফ্যাট -০১ গ্রাম, টোটাল কার্বহাইড্রেড ৬.২ গ্রাম, ফাইবার ০.৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম + ফসফরাস + লোহা + সোডিয়াম + পটাসিয়াম ০.৬ গ্রাম। আর পাকা পেঁপেতে ১০০ গ্রামে থাকে ৪২ ক্যালরি শক্তি।

পেঁপেতে প্যাপাইন নামে রাসায়নিক থাকে যা পেঁপের অনেক গুণের উৎস। প্যাপাইন প্রধানত হজমকারক। পাকা পেঁপেতে বিটা ক্যারাটিন কাঁচা পেঁপের তুলনায় ৭০ গুণ বেশি থাকে। দ্বিগুণ পরিমাণে ভিটামিন সিও থাকে। মাংসের জটিল প্রোটিনকে প্যাপাইন সরল প্রোটিনে পরিণত করে ফলে হজমে সুবিধা হয়। নানা ধরনের পোড়াতেও পেঁপে ভালো ওষুধের ভূমিকা পালন করে। জয়েন্টে ব্যাথা, হাড়ে ব্যাথা, লিগামেন্টের চোটে পেঁপের রস ভালো কাজ দেয়। ত্বকের নানা সংক্রমণ, দাগ ইত্যাদিতেও পেঁপের রস কার্যকরী।

প্যাপাইন রিজেনারেটিভ মেডিসিন হিসাবে কাজ করে। হলিউডের অভিনেতা হ্যারিসন ফোর্ডের পিঠে ডিস্ক র‍্যাপচার হয়েছিল, সেই সময়ে প্যাপাইন থেকে তৈরি ইনঞ্জেকশন দিয়ে তাঁকে ভালো করে তোলা হয়। হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখে এবং শরীর ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিবোধ দূর করে। পেঁপেতে ল্যাটেক্স বা তরুক্ষীর পাওয়া যায়। পেঁপের এই ল্যাটেক্স অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে কাজ করে। এটি ডিসপেপসিয়া এবং পেটের নানা ধরনের অসুখ সারাতে ব্যবহৃত হয়।

গ্রামেগঞ্জে পেটের রোগ সারাতে বাতাসার ভেতর এক ফোঁটা তরুক্ষীর ফেলে রোগীকে খাইয়ে দেওয়া হয়। তবে ল্যাটেক্স বা তরুক্ষীর থেকে চামড়ার জ্বলনি বা অ্যালার্জি হতে পারে। পশুদের শরীরের পোকা মারতে ল্যাটেক্স-এর জুড়ি নেই। কাঁচা পেঁপের রস ইসবগুলের মিশিয়ে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীদের ক্ষেত্রে খুব ভালো ফল দেয়। বেশিসময় পেঁপে কেটে রাখলে মাছি ডিম পেড়ে পেঁপেকে বিষাক্ত করে দেয়। পেঁপে ইউরিনের অ্যাসিডিটি কমায়। নাইট্রেট মিশ্রিত মাটিতে জন্মানো গাছের পেঁপে খেলে শরীরে অস্বস্তি হয়। এদিক-ওদিক চুলকায়। পেঁপের মধ্যে থাকা প্যাপাইন হাইপ্লোসেনিক হওয়ায় তা সুগারের রোগীদের পক্ষে ভালো। মাথাব্যথা, আলসার, দাঁতের ব্যথা, বিছের কামড়, কিডনির রোগ-সহ ৪০টির মতো রোগের বিরুদ্ধে ওষুধের কাজ দেয় পেঁপে।

মধ্য আফ্রিকাতে কাঁচা পেঁপের রস দিয়ে সিফিলিসের চিকিৎসা হয়। কিউবাতে রিং ওয়ার্ম, সিরোসিস প্রভৃতির ওষুধ হিসাবে পেঁপে ব্যবহার করা হয়। হাওয়াই দ্বীপের লোক পেঁপের মোরব্বা তৈরি করে খায়। পুতেতোরিকোতে টুকরো প্রক্রিয়াকরণের পর মধুর প্রলেপ দিয়ে চকোলেটের মতো বিক্রি হয়। এটি একটি ভালো ফুড সাপ্লিমেন্ট। মধ্য আমেরিকা পেঁপের আদি উৎপত্তিস্থল। বোলতা, মৌমাছি কামড়ে দিলে পাকা পেঁপে একটুকরো সেই ক্ষতস্থানে ঘণ্টা খানেক লাগিয়ে রাখলে ব্যথা দূর হয়, বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি লাভ হয়। পেঁপে চোখের কর্নিয়া নরম হওয়া প্রতিরোধ করে। ▮

করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই

ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা (WHO) ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণকে মহামারি ঘোষণা করেছে। সারা বিশ্বে বাড়ছে সংক্রামিতের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যার গ্রাফটাও ঊর্ধ্বগামী। ফলে চিন্তা হবারই কথা। করোনা ভাইরাস এখন সবচেয়ে আলোচ্য বিষয়। আন্টারটিকা ছাড়া সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে করোনা। করোনা মানে লাতিন ভাষায় মুকুট। বহু দশক ধরে করোনা ভাইরাস উপস্থিত। ভাইরাসের নানান স্ট্রেইন হয়। সাতটি স্ট্রেন এখন অবধি পাওয়া গেছে। ২০০৩ সালের আশেপাশে সার্স বলে একটি রোগের সৃষ্টি হয়। নানান দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু মানুষ আক্রান্ত হয়। বেশ কিছু মানুষের মৃত্যুও হয়। এরপরে সারা বিশ্ব আরেকটি জীবাণু সংক্রমণের কবলে পড়ে, এটাকে চিহ্নিত করা হয় মিডল ইষ্ট রেস্পিরেটরি সিন্ড্রোম নামে। সালটা ২০১৪ থেকে ২০১৫। আরব দেশে সূচনা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

করোনা ভাইরাস মানে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তা নয়। কিছু ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস বিপজ্জনক রূপ আকার নেয়। সার্স ও মর্স সংক্রমণে যেমন হয়েছিল।

উপসর্গ কী? সাধারণ ভাইরাসের যা উপসর্গ তাই। কাশি, সর্দি, জ্বর, শ্বাস নিতে কষ্ট। আলাদা করা সম্ভব নয়।

কীভাবে চিহ্নিত করতে হবে? গলার সোয়াব পরীক্ষা করে। পরীক্ষার পদ্ধতি RT-PCR, রক্ত পরীক্ষা মারফৎ অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করে পাওয়া যায়। নতুন করোনা ভাইরাস পরিচিত Covid 19 নামে।

সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন

- গরম জল এবং সাবান দিয়ে ঘন ঘন হাত ধোন। অ্যালকোহল মিশ্রিত স্যানিটাইজার এক্ষেত্রে আরও উপযোগী।
- হাত এবং হাতের আঙুল যতটা সম্ভব চোখ নাক এবং মুখের কাছ থেকে দূরে রাখুন।
- সংক্রমিত ব্যক্তির কাছে যাবেন না।
- গলায় ক্ষতের উপসর্গ-সহ জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ওষুধ খান।
- পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।
- বেশি করে জল এবং ফলের রস খান।
- গলায় ক্ষতের উপশমে বাতাসে আর্দ্রতা বৃদ্ধির যন্ত্র খুবই উপকারী।
- সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে বা শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

তথ্যসূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া।

ভাইরাস কখন বেশি আক্রমণাত্মক হয়?

যাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমে যায়।

(১) যাদের বয়স ৬৫-এর বেশি, তাঁদের ঝুঁকিও বেশি। (২) কর্কট রোগ হবার কারণে কোমোথেরাপি নিচ্ছেন, এমন রোগীদের ওপরও করোনা মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। (৩) বহুদিন স্টেরোয়েড নিচ্ছেন যারা, তারাও আক্রান্ত হচ্ছেন। (৪) ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্তদের করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল। (৫) বাইপাস সার্জারি হওয়া রোগীদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি।

করোনা ভাইরাস এইবার কিন্তু ব্যতিক্রমী। ৫০ থেকে ৫৫ বছরের মানুষের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে চীনে।

করোনা ভাইরাসের কোনো চিকিৎসা আছে কি?

না আছে চিকিৎসা আর না আছে এর প্রতিষেধক। এই কারণেই সার বিশ্বের মানুষ আতঙ্কিত।

কীভাবে আটকনো যাবে?

এই ভাইরাস মূলত হাতের মাধ্যমেই শরীরে প্রবেশ করে তাই ভালো করে হাত ধুতে হবে। সাবান বা অ্যালকোহল ভিত্তিক স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। আর মনে রাখবেন কারোর যদি কাশি হয়, অবশ্যই মুখে রুমাল বা টিসু পেপার রেখে কাশুন, আর যদি কিছুই কাছে না থাকে, তাহলে মুখে হাত চাপা দিয়ে কাশুন। অন্যরা, যিনি কাশছেন, তাঁদের থেকে অন্তত ১ মিটার দূরে রাখুন নিজেকে। সবসময় বিশেষ করে বাইরে বেরোলে মুখ ঢাকুন মাস্কে।

(লেখক আর. এন. টেগোর হাসপাতালের ঔষধ বিশেষজ্ঞ)

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সাধারণ চিকিৎসাতেই সারে এই সংক্রমণ

ডাঃ বিজয় গুহ রায়

করোনা ভাইরাস নিয়ে অহেতুক আতঙ্ক বাড়ছে। আতঙ্কিত হবার মতো কোনো কারণ কিন্তু আমি দেখছি না। কেননা এই সময়ে বিশেষ করে দুটি ঋতুর সন্ধিক্ষণে সাধারণ ফ্লুর মতো উপসর্গ দেখে অনেকেই প্রাথমিক ভাবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার বিষয়ে ভাবতে শুরু করছেন। তাঁদের বলছি, নিজে নিজে এসব মনে করবেন না। যদি মনেই হয়, তাহলে চিকিৎসকের কাছে যান, তাঁর পরামর্শ মতো কিছু পরীক্ষা করে, সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করুন। এটি সাধারণ ফ্লুর মতো হলেও কয়েকটি সাধারণ বিষয় দেখে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করলে তবেই পরীক্ষা করাতে বলব। যেমন, সর্দি, হাঁচি, কাশি সঙ্গে আচমকা শ্বাসকষ্ট হলে, তবেই সন্দেহ প্রকাশ করব আমরা। এই প্রসঙ্গে বলি, ধরুন একজন হাঁপানি রোগী যদি শ্বাসকষ্ট নিয়ে আমাদের কাছে আসেন, তাহলে কিন্তু আমরা তাঁকে সন্দেহের তালিকা থেকে দূরে রাখব। আরেকটি বিষয় মনে রাখবেন, যারা শারীরিক ভাবে একেবারেই সুস্থ, তাঁদের এই সংক্রমণের ভয় নেই যদি না তিনি এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। আর যাদের নানা কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে, তারা এই রোগে সংক্রমণের শিকার খুব তাড়াতাড়ি হতে পারেন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ণয়ের জন্য কোনো পরীক্ষা এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যের সিংহ ভাগ হাসপাতালে নেই। শুধুমাত্র বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে থাকা নাইসেডে করা হয়ে থাকে। পুনাতে এই ভাইরাস সংক্রমণ নির্ণয় করার পরীক্ষা হয়ে থাকে। এই রাজ্য থেকে পাঠানো হয় নমুনা। আমরা একজন সন্দেহপ্রবণ রোগীকে অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করতে বলে থাকি। কেননা এই পরীক্ষা থেকেই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের বিষয়টি ধরা পড়ে থাকে। সংক্রামিত রোগীকে তড়িঘড়ি চিকিৎসা দিতে হবে, নইলে এই ভাইরাসের চরিত্র এমনই যে মুহূর্তে একজন আক্রান্তের প্রথমে ফুসফুস ও পরে নানা অর্গ্যানকে অকেজো করে দেয়। ফলে রোগী মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বলি, যদি মৃত্যু পরোয়ানার কথাই বলা হয়, তাহলে সেই হার একেবারেই নগণ্য। তাই আমার মতে সামান্য কয়েকটি বিষয়কে মানলেই আক্রান্ত হবার হাত থেকে যখন রেহাই পাওয়া যায়, তখন অহেতুক আতঙ্ক কেন?

আমার মতে, হু বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত কিছু বিধি নিষেধ, যেমন মাস্ক ব্যবহার করা, মুখে-নাকে-চোখে হাত দেবার আগে বা খাবার খাবার আগে বা বাইরে থেকে এলে আগে স্যানিটাইজার বা সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, কাশি হলে মুখে রুমাল বা কাপড় বা হাত চাপা দিয়ে কাশতে হবে, হাঁচছে বা কাশছে এমন ব্যক্তির থেকে কমপক্ষে ১ মিটার দূরে থাকতে হবে। আর সর্দি, হাঁচি, কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক বা স্থানীয় হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে। আবারো বলি, অহেতুক আতঙ্ক ছড়াবেন না, বা যে কোনো ধরনের গুজব থেকে দূরে থাকুন। আরেকটি বিষয়, এই রোগের জীবাণু মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। প্রাণীদের মধ্যে বাদুড়ের শরীরেই থাকে এই জীবাণু। ফলে আজ যে মুরগির মাংস বা পাঁঠার মাংস খাওয়া নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তাও আমার কাছে ঠিক মনে হয়নি। আবারও বলি অহেতুক আতঙ্ক বা ভয় নয়। করোনা ভাইরাসে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুযোগ একেবারেই আমাদের এই রাজ্যে নেই। সামান্য কিছু হলেই সারা দেশের সমস্ত সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান দেবেন। অহেতুক ভুলপথে চালিত করবেন না তাঁরা।

(লেখক সিনিয়র কনসালট্যান্ট, মেডিসিন বিভাগ, বেহালা বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল)

করোনা সংক্রমণ মানেই মৃত্যু নয়

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মানেই কি মৃত্যু? এখনও পর্যন্ত যা তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে বলা যেতে পারে গুজবে কান দেবেন না। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মানেই মৃত্যু নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, সারা বিশ্বে এখনও পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত ব্যক্তির সংখ্যা ১,৩৪,৯১৮ জন। এদের মধ্যে মারা গেছেন ৪,৯৮৯ জন। সুস্থ হয়েছেন ৭০,৩৯৫ জন। অর্থাৎ করোনা ভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যুর হার ৪ শতাংশেরও কম। সুস্থতার হার ৫৩ শতাংশ। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। অসুস্থ হয়ে পড়লে কী করবেন আর কী করবেন না যদি জানা থাকে তাহলে করোনা ভাইরাস আপনার কিছুই করতে পারবে না।

সর্দি, কাশি, জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট হলে—

১। কী করবেন :

অবিলম্বে কোনও চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। অথবা নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন।

২। কী করবেন না :

অসুস্থতার কথা পরিবারের কারোও কাছে গোপন করবেন না। তাতে আপনি তো বিপদে পড়বেনই, আপনার সঙ্গে পরিবারের সদস্যরাও সংক্রামিত হবেন। আপনাকে সুস্থ করে তুললেই যেখানে ভাইরাসকে প্রতিহত করা যেত সেখানে আপনারই ভুলে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে করোনা ভাইরাস। সংক্রামিত হবেন বহু মানুষ।

কেন্দ্রের অতিরিক্ত ভ্রমণ নির্দেশিকা

বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের খবর মিলেছে। যে সমস্ত মানুষ এই দেশগুলিতে সফর করছেন বা যে সমস্ত ব্যক্তি বিদেশ সফর করেছেন, তাদের কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বিমানবন্দরগুলিতে যাতায়াতের সময় বা ওই দেশগুলিতে থাকার সময় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আক্রান্ত দেশগুলির মধ্যে কয়েকটি দেশে বিপুল সংখ্যায় মৃত্যুর খবর মিলেছে। তাই ওই দেশগুলিতে যাতায়াতকারী যাত্রীদের এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার বড়ো ঝুঁকি রয়েছে। সেই অনুসারে, গত ৬ মার্চ জারি করা ভ্রমণ নির্দেশিকা মেনে চলা-সহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে :

১. যারা বিদেশ থেকে ভারতে ফিরছেন তাদের স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখা-সহ সরকারের পক্ষ থেকে কী করণীয় এবং কী করণীয় নয় তা মেনে চলতে বলা হয়েছে।

২. এছাড়াও, সমস্ত যাত্রী যারা ইতিমধ্যেই চীন, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইতালি, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইরান, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন ও জার্মানি সফর করেছেন দেশে ফেরার পর তাদের বাড়ির অন্যান্যদের সংস্পর্শ থেকে ১৪ দিন দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যদি কোনো যাত্রী কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকেন, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কর্তাকে সেই ব্যক্তি যাতে বাড়ি থেকে কাজ করতে পারেন তার বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

৩. ভিসা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি ইতিমধ্যেই জারি করা যাবতীয় নির্দেশাবলী-সহ গত ১১ মার্চ বা তার পূর্বে ফ্রান্স, জার্মানি এবং স্পেনের নাগরিকদেরকে প্রদেয় সমস্ত নিয়মিত ভিসা বাতিল করা হয়েছে। এই তিন দেশের যে সমস্ত নাগরিক এখনও ভারতে এসে পৌঁছাননি, তাদের ক্ষেত্রেও ভিসা বাতিলের নির্দেশাবলী কার্যকর থাকছে।

৪. ই-ভিসা-সহ সমস্ত নিয়মিত ভিসা যে সমস্ত বিদেশি নাগরিককে পয়লা ফেব্রুয়ারি বা তার পূর্বে দেওয়া হয়েছে, তারা যদি ফ্রান্স, জার্মানি ও স্পেন ইতিমধ্যেই সফর করেছেন কিন্তু এখনও ভারতে আসেননি, তাদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে।

৫. যে সমস্ত বিদেশি নাগরিক ভিসা নিয়ে ভারতে রয়েছেন তাদের ভিসা বৈধ থাকছে। এই বিদেশি নাগরিকরা তাদের ভিসা বা দূতাবাস সংক্রান্ত অন্যান্য কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনে ভিসার মেয়াদ বাড়াতে নিকটবর্তী এফআরআরও/এফআরও কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

ভ্রমণ সংক্রান্ত অতিরিক্ত এই নির্দেশাবলী কার্যকর করতে অভিবাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে করোনা

- করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত সন্দেহে এখনও পর্যন্ত ২ জন ব্যক্তিকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
- রাজ্যের অন্য হাসপাতালগুলিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত সন্দেহে ভর্তি রয়েছেন ৫ জন।
- নিজের বাড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৭০৮ জন।
- মোট ৪০ জনের স্যাম্পেল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কারোও রক্তেই করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি।
- ৯ মার্চ অবধি কলকাতা এবং বাগডোগরা বিমানবন্দরে ৬১ হাজার ২০২ জনকে পরীক্ষা করা হয়েছে।
- নেপাল ও বাংলাদেশ সীমান্তের ৭টি চেক পয়েন্টে ১,১১,৭১২ জনকে পরীক্ষা করা হয়েছে।
- তিনটি বন্দরে ৩,৫৩৪ জন নাবিককে পরীক্ষা করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য ও পরামর্শের জন্য রাজ্য সরকারের হেল্পলাইন : ১৮০০-৩১৩-৪৪৪-২২২/(০৩৩) ২৩৪১-২৬০০।

তথ্যসূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া।

করোনা ভাইরাস জীবাণু যুদ্ধের অস্ত্র নয়তো ?

স্বপন দাস

জীবাণু যুদ্ধ শব্দটা আমাদের কাছে সাময়িক অপরিচিত হলেও, বিশ্বের সমর পরিকল্পকদের কাছে অপরিচিত নয়। কেননা বিশ্বের যে কোনো জাতিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে এই অস্ত্র সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এই অস্ত্রের আঘাত যেমন নিঃশব্দে নেমে আসে, তেমনি একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে শেষ করে দেয়।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, সেটা কীভাবে সম্ভব? সেই প্রশ্নের উত্তরে পরে আসব।

চীনে এখন করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে। মৃতের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে শুরু করেছে। পাশাপাশি দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। অন্যদিকে ইরানের বা ইতালির ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা। এখন আমাদের দেশেও ঢুকে পড়েছে এই করোনা আতঙ্ক। আক্রান্তের তালিকা ১৩০ কোটির দেশে মাত্র ১০৭ এবং এই আক্রান্তেরা সবাই কোনো না কোনো ভাবে বিদেশ থেকে এই ভাইরাস বহন করে নিয়ে এসেছে। যদিও করোনা ভাইরাসের বেড়ে ওঠার জন্য যে পরিবেশ দরকার, সেই অনুকূল পরিবেশ আমাদের দেশে নেই। আবারো একই কথার পুনরাবৃত্তি করছি যে এখনও পর্যন্ত যে সব আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গেছে, তাঁরা সবাই বাইরের দেশ থেকে এই দেশে এসেছেন। আর বহন করে এনেছেন এই ভাইরাস। তবে সাবধানের তো মার নেই। যাতে এই ভাইরাস আমাদের এই দেশে তার মারণ থাবা বসাতে না পারে সেটার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সচেতনতা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় ভাবে সরকার গ্রহণ করে ফেলেছে। আর এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্যের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থও মঞ্জুর করেছে। যাতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয়।

এবার ফিরে আসি আগের কথায়। ভাইরাস যুদ্ধের শুরু আজকের দিনে নয়। খ্রিস্টজন্মের ৩০০ বছর আগেও এই যুদ্ধের কথা গবেষকরা জানতে পেরেছেন। তাঁদের মতে এই জীবাণু যুদ্ধ তার থেকেও অনেকটাই প্রাচীন। অনেক গবেষক বলেন ১৫০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম শুরু হয়েছিল এই জীবাণু অস্ত্রের প্রয়োগ। সেই সময় কোনো মারণ জীবাণু পাখির শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই পাখিটাকে উড়িয়ে দেওয়া হতো। সেটা শত্রু এলাকায় গিয়ে মরে গেলে, সেখানকার কোনো পশু বা পাখিতে সেই দেহাবশেষ খেত। আর এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়ত সেই দেশে। একদল গবেষক দেখেছেন, আজকের দিনের মানববোমার মতো কোনো একজন সৈনিকের শরীরে জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। সে শত্রুর এলাকায় গিয়ে নিজের শরীরের সংস্পর্শে অন্য প্রাণী বা কিছুকে এনে ছড়িয়ে দিত সেই জীবাণু। আবার জীবাণু দিয়ে পশু মেরে, সেই মৃত পশুকে ফেলে দেওয়া হতো কুয়োতে বা জলাধারে, তা থেকে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যুর মাকড়শার জালে জড়িয়ে নিত শত্রু শিবিরের মানুষজনকে। এছাড়াও বিষ মাখানো তির বা জীবাণু মাখানো তিরের কথাও জানতে পারি বিভিন্ন সময়ের গবেষণা পত্র থেকে। বা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা থেকে।

আধুনিক সময়ে যখন পারমাণবিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা এসেছে তখন এই জীবাণু যুদ্ধকেই হাতিয়ার করে ময়দানে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে অনেক দেশ। আর তাঁদের নিজেদের গবেষণাগারে তৈরি করছে নানা মারণব্যাধির জীবাণু।

এই বিষয়ে প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের অবতারণা না করে থাকতে পারা যাচ্ছে না। গত শতকে ৫০ কোটি মানুষ মারা গেছেন শুধুমাত্র জীবাণু সংক্রমণে। পুরোটাই টক্সিন কেন্দ্রিক জীবাণু। যে ধরনের জীবাণু একসময়ে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সেই সময়ে জাপানীরা এই জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করেছিল চীনের বিরুদ্ধে। সালটা ছিল ১৯২৫। আবার এই অস্ত্র একই ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ১৯৭২ সালেও। এক্ষেত্রে এই জীবাণু যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, আর টক্সিন খুব পরিচিত নাম। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জাপানিদের জীবাণু হাতিয়ার চীনের এক হাজারটি পানীয় জলের

আস্তিনের তলায় কী জীবাণু অস্ত্র কে কতটা লুকিয়ে রেখেছে, সেটা জানা শিবেরও অসাধ্যি। ফলে বিপদ আরও বাড়ছে। ...জীবাণু অস্ত্র এমন ভয়ংকর হয়ে নেমে আসছে যে, তাকে মোকাবিলা করার মতো সময় পাচ্ছে না আক্রান্ত দেশগুলি।

কুয়োকে দুষিত করে দিয়েছিল। আর এই কারণে সেই সময়ে চীনে কলেরা ও টাইফাসের মতো রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। শোনা যায় এই জীবাণু অস্ত্র বিমান থেকে ফেলা হয়েছিল। এরপর ১৯৭৪ সালে ব্রাসেলসে, ১৯৯৯ সালে হেগে— দুটি ঘোষণাতে এই জীবাণু যুদ্ধের পায়ে শিকল পরানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজো থামানো যাচ্ছে না এই জীবাণু অস্ত্র। এই জীবাণু অস্ত্র ব্যবহারকারী হিসেবে জার্মানির নাম আসে সবার আগে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁরা রাসায়নিক অস্ত্রের সঙ্গে জীবাণু অস্ত্রও ব্যবহার করেছিল।

জীবাণু যুদ্ধের ব্যাপারে অ্যান্থ্রাক্স জীবাণুর নাম আসে সবার আগে। এই অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল পশুদের ওপর। তা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মানুষের মধ্যে।

এখন বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মারণ হাতিয়ারের গবেষণা। একটি জীবাণু অস্ত্র আবিষ্কার হলে, তার পাল্টা আরেকটি অস্ত্র গবেষকরা বের করে ফেলছেন। এগুলির কোনোটাই সভ্যতার বিকাশের জন্য নয়। এই অস্ত্রের গবেষণা ও তার সফল ভাবে প্রয়োগ করার কৌশল হাতের মুঠোয় এনে দিতে পারে বিশ্বের ক্ষমতাকে। আস্তিনের তলায় কী জীবাণু অস্ত্র কে কতটা লুকিয়ে রেখেছে, সেটা জানা শিবেরও অসাধ্যি। ফলে বিপদ আরও বাড়ছে। এখন অবশ্য এই অস্ত্র সৈনিক মারার জন্য শুধু নয়। ব্যবহার করা হচ্ছে চোরাগোপ্তা ভাবে সাধারণ মানুষের ওপর— এমনকী কৃষিক্ষেত্রের ওপরেও। এটা আর কিছুই নয়, সামাজিক দিক দিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবার জন্য। মানুষের মৃত্যু মিছিলের ধারা যখন একটা দেশকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে, অলক্ষ্যে হেসে চলে ব্যবহারকারী। এখনকার জীবাণু অস্ত্র এমন ভয়ংকর হয়ে নেমে আসছে যে, তাকে মোকাবিলা করার মতো সময় পাচ্ছে না আক্রান্ত দেশগুলি। এমন ভাইরাস ল্যাবে তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো রকম সাহায্য পাচ্ছে না মোকাবিলা করার জন্য।

আমাদের দেশ ভারতেও এই জীবাণু যুদ্ধের থাবা এসেছে বারে বারে। প্রথম এসেছিল স্মল পক্সের জীবাণু অস্ত্র নিয়ে। পরে প্লেগ, তারও পরে কিউ-ফিভার ও অ্যান্থ্রাক্স নিয়ে। তার মোকাবিলা অল্প সময়েই করে ফেলেছেন আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা।

এবারের করোনা ভাইরাস নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এটি সেই জীবাণু অস্ত্র নয়তো? কেননা চরিত্রগত দিক দিয়ে এটি একই শ্রেণীর। সারা বিশ্ব এখন নানা ধরনের সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপে জেরবার। তাদের কাছে এই জীবাণু অস্ত্র একমাত্র আঘাতের মাধ্যম হয়ে উঠছে দিনকে দিন। সেটাই ভয়ের। আর সবচেয়ে ভাবনার বিষয়, এটি খুব সামান্য আয়াসে, একটা পায়রা বা পাখি অথবা কুকুরের মতো প্রাণীর মধ্যে দিয়েও ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তিন থেকে সাতদিনের মধ্যে এই জীবাণু অস্ত্র আঘাত হানতে পারে নিঃশব্দে। অল্পক্ষণেই মারাত্মক আকার নিয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। সে ভাবেই ল্যাবে তৈরি করা হয় এই জীবাণু অস্ত্র।

এই জীবাণু অস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায় একটি দেশের অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো। সামাজিক পরিকাঠামোতে আসে চরমতম আঘাত। বৈদেশিক বাণিজ্য একেবারেই বন্ধ হয়ে যেতে বসে। আর এই অর্থনৈতিক আঘাত একটা দেশকে চরমতম সাময়িক অস্থিরতার মুখে শুধু নয়, চরমতম সংকটের মুখেও ফেলে দেয়। আজকের ভারত বিজ্ঞানের দিক দিয়ে গত সাত বছরে এতটাই এগিয়ে যে, এখানকার গবেষকরা সব ধরনের জীবাণু অস্ত্রের মোকাবিলা করতে সক্ষম। ফলে বিশ্বের অন্য দেশের থেকে ভারত এই মুহূর্তে একশো কদম এগিয়ে। আমাদের দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রের গবেষকরা এতটাই অভিজ্ঞ ও পারদর্শী যে তারা যে কোনো ধরনের পরিস্থিতিকে সামলে দেবার ক্ষমতা রাখেন। ফলে ভারতের জীবাণু অস্ত্রকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

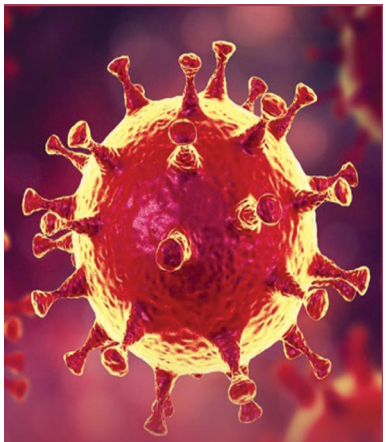

জীবাণু অস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায় একটি দেশের অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো। সামাজিক পরিকাঠামোতে আসে চরমতম আঘাত। বৈদেশিক বাণিজ্য একেবারেই বন্ধ হয়ে যেতে বসে। আর এই অর্থনৈতিক আঘাত একটা দেশকে চরমতম সাময়িক অস্থিরতার মুখে শুধু নয়, চরমতম সংকটের মুখেও ফেলে দেয়।

ন্যশনাল আয়ুর্বেদ স্টুডেন্টস্ অ্যান্ড ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনা সভা

ন্যাশনাল আয়ুর্বেদ স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং অখিল ভারতীয় আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় হোমিওপ্যাথি সংস্থান কলকাতার সহযোগিতায় গত ৪ মার্চ রঘুনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে 'আয়ুর্বেদ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফার্মাকোভিজিল্যান্স-এর প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ ঔষধি বিকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানী ডাঃ অচিন্ত্য মিত্র এবং ইমানি লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ পবন কুমার শর্মা। ধন্বন্তরী বন্দনা ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন রঘুনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়ে হাসপাতালের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ স্বরূপ কুমার দে। উপস্থিত ছিলেন রসশাস্ত্র এবং ভৈষজ কল্পনা বিভাগের বিভাগীয় অধ্যক্ষ ডাঃ সুব্রত কুমার ভুটিয়া এবং দ্রব্যগুণ বিভাগের বিভাগের বিভাগীয় অধ্যক্ষ ডাঃ রবীন্দ্রনারায়ণ রায়।

বক্তাগণ ফার্মাকোভিজিল্যান্স ও তার প্রয়োজনীয়তা, রসশাস্ত্র, ভৈষজ্যকল্পনা ও দ্রব্যগুণ বিজ্ঞানে তাদের প্রয়োগ তুলে ধরেন। ডাঃ পবন কুমার শর্মা ও ডাঃ অচিন্ত্য মিত্র চিকিৎসা ক্ষেত্রে ফার্মাকোভিজিল্যান্সের বাস্তবিক প্রয়োগ উদাহরণের মাধ্যমে আলোকপাত করেন।

আলোচনা সভায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, ৩০ জন প্রফেসর ও ২৫ জন জুনিয়র ডাক্তার অংশগ্রহণ করেন। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

দোল উপলক্ষ্যে শিবপুরে হরিনাম সংকীর্তন

প্রতিবারের মতো এবারও দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে হাওড়ার শিবপুরে এক নগর সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ হরিনাম সংকীর্তন শহরের হাজার হাত কালীতলা, জহুরা কালীবাড়ি, ষষ্ঠীতলা প্রভৃতি বহু মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তজনের সঙ্গে মিলিত হয়। শোভাযাত্রার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সুসজ্জিত বিগ্রহে বহু মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সংকীর্তন শেষে শিবপুর সঙ্ঘ কার্যালয়ে সবাই মিলিত হন। সেখানে নবতিপর স্বয়ংসেবক পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় দোলপূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

ডানকুনিতে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাজ্য সম্মেলন

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হুগলী জেলার ডানকুনি শহরের জিবি কমপ্লেক্সে। ১৩টি জেলা থেকে শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পূর্বতন অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক সরোজ মিত্র। সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পূর্বতন অখিল ভারতীয় সংযোজক বর্তমানে সহ সংযোজক অরুণ ওঝা। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের ওপর বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র প্রচারক প্রদীপ যোশী। সন্ধ্যায় স্বদেশী সন্দেশ যাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। তাতে প্রতিনিধি ও স্থানীয় স্বদেশী সমর্থক বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় সত্রে পরিবেশ সচেতনতার ওপর বক্তব্য রাখেন কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। তৃতীয় সত্রে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিদৃশ্যের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক ড. ধনপতরাম আগরওয়াল।

দ্বিতীয়দিনে স্বর্গত দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর জীবন ও কর্মের ওপর বক্তব্য রাখেন সরোজ মিত্র। এদিন 'পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও পরিবেশ' এবং ' পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প' — এই দুটি বিষয়ের ওপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংঘর্ষ বাহিনী প্রমুখ অন্নদা পাণিগ্রাহী। সম্মেলন পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অম্লান কুসুম ঘোষ ও সংগঠন সম্পাদক সুব্রত মণ্ডল।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সম্মেলন

গত ৮ মার্চ হুগলী জেলার ব্যান্ডেলে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় 'বন্দে মাতরম্' ভবনে। ৬৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন ও সরস্বতী বন্দনার মধ্যমে সম্মেলনের শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, সহ সভাপতি বাপি প্রামাণিক ও শিউমণি সাউ, রাজ্য সহ সম্পাদক তারাশঙ্কর চক্রবর্তী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক আশিস কুমার মণ্ডল প্রমুখ।

সম্মেলনে নতুন জেলা সমিতি গঠিত হয়। রাজকুমার দাস, বিকাশ সাউ ও অমল চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারতের ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

গত ৪ মার্চ কলকাতার আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে ভারতের ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ কেন্দ্রের (জিএসআই) ১৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উপস্থিত চিলেন সংস্থার মহানির্দেশক এম শ্রীধর। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভূগর্ভে সঞ্চিত নানা ধরনের খনিজ পদার্থ খোঁজার লক্ষ্য ভারতের ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ কেন্দ্র ১২টি ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছে। রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও মহারাষ্ট্রে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে সম্ভাব্য খনিজ পদার্থসম্পন্ন ৬০ শতাংশ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি জানান, দেশের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এরজন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। জিএসআই খুব শীঘ্রই ছত্তিশগড়, ওড়িশা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু সরকারের হাতে ২৫টি খনিজসম্পদ অনুসন্ধান বিষয়ক প্রতিবেদন তুলে দেবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মাটির গভীর থাকা খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের কাজ চালানো হচ্ছে বলে জানান। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা জিএসআই কার্যালয়ের ভূবিজ্ঞানীদের সমন্বয় রেখে একযোগে কাজ করারও আহ্বান জানান শ্রীধর। দেশের শিল্পের বিকাশে জিএসআই অগ্রবর্তী ভূমিকা নিচ্ছে বলেও তিনি জানান। ভূমি ধ্বসের আগাম সতর্কতা, ভূমিকম্প, সুনামি, বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধে জিএসআই কাজ করছে। মহানির্দেশক আরও জানা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খনিজ সম্পদ আহরণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের খনিজ মন্ত্রক 'ভূমিসংবাদ' কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। অনুষ্ঠানে জিএসআই-এর কর্মী সন্তোষ কুমার ঠাকুরকে ২০১৯-এর ভিজিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরের বর্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রয়াত হুগলী বিভাগ সঙ্ঘচালক ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের ১১৪ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ২৭ তম রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং দ্বারহাট্ট ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে শিশুমন্দিরের ভাই-বোন, আচার্য-আচার্যা ও গ্রামবাসী এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে পথ পরিক্রমা করে।

দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে তাঁর মর্মর মূর্তিতে মাল্যার্পণ ও পুষ্প প্রদানের মাধ্যমে শিবিরের শুভারম্ভ হয়। কলকাতা লায়নস ক্লাবের তত্ত্বাবধানে ৭৫ জন রক্তদান করেন। ৪০ জনের ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, ২১ জনের ইসিজি, ২৫ জনের ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা, ২০ জনের চর্মরোগের চিকিৎসা, ১০টি শিশুর চিকিৎসা এবং ২৫ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসা করেন বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিমাই দাস, শিশুচিকিৎসক ডাঃ চন্দ্রকান্ত ঘোষ, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রভাকর সামন্ত প্রমুখ। শিশুমন্দিরের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ তিনদিনের সেবামূলক, প্রতিযোগিতামূলক এবং নবম ও দশম শ্রেণীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিন উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার পূর্বতন সঙ্ঘচালক ডাঃ বনমালী ভড়, প্রবীণ প্রচারক অরবিন্দ দাশ, শঙ্কর মিত্র, মধুময় নাথ এবং মহারাজের স্নেহধন্য আনন্দমোহন দাস। দ্বিতীয়দিনে অনুষ্ঠিত হয় অঙ্কন, হস্তলিখন, সংগীত, আবৃত্তি, বিজ্ঞান মডেল ও কুইজ। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুল থেকে ৫০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিষয়ক বিভাগীয় প্রধান ড. মৈনাক দে এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন হরিপাল গুরুদয়াল ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক সুদীপ মুখোপাধ্যায়। তাঁরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অন্তিম দিনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিদ্যাভারতীর পূর্বক্ষেত্র কার্যকারিণীর সদস্য তথা প্রবীণ প্রচারক বিজয় গণেশ কুলকার্ণী। তিনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধাপক ড. রতন কুমার ঘোষাল, দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ঘোষ এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের কোষাধ্যক্ষ সমর গুঁই। অতিথিরা মেধার ভিত্তিতে প্রতিটি শ্রেণীর ২০১৯ সালের বার্ষিক ফলের ওপর নির্ভর করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পরিশেষে শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেদের দ্বারা রঙ্গমঞ্চ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

মহাভারতের পথের দিশারি ডাঃ হেডগেওয়ার

বিনয়ভূষণ দাশ

কিছু মানুষ, কিছু সমাজনেতা তাঁদের যুগের প্রচলিত চিন্তাভাবনার তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকেন। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে এমন মানুষের অভাব হয়নি। ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ভারতমাতার এমনই এক মহান সন্তান। প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে বহুমুখী কর্মযজ্ঞের ঋত্বিক ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের আলোচনা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে তাঁর বিস্তৃত কর্মযজ্ঞের কিছু বিবরণ দিতে চেষ্টা করব।

দীর্ঘ প্রায় আটশো বছরের বিদেশি শাসনে ভারতবর্ষে শতশত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। কিছু কিছু দেশনেতা থাকেন যারা দেশ ও সমাজের তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানে ব্রতী হন, আর কিছু দেশনেতা থাকেন যারা অনেক এগিয়ে ভাবেন। তাঁদের চিন্তাভাবনায় থাকে অনাগত ভবিষ্যতের রূপরেখা। তাঁরা তাঁদের সময়কে অতিক্রম করে যান। তাঁদের কাজকর্ম স্থির হয় অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার হলেন এমনই এক যুগন্ধর, স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ। ডাঃ হেডগেওয়ার জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৬ বিক্রম সংবতের চৈত্র শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে (ইংরেজি ১ এপ্রিল, ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে), তৎকালীন মধ্যভারতের নাগপুর শহরে। তাঁর পিতা বলিরাম পন্ত হেডগেওয়ার এবং মাতা রেবতী বাই। তাঁর পরিবার মূলত বর্তমান তেলেঙ্গানা রাজ্যের নিজামাবাদ জেলার কুন্দকুর্তি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কয়েক পুরুষ আগেই তাঁর পূর্বপুরুষ সেখান থেকে তাঁদের বাসস্থান নাগপুরে স্থানান্তর করেন। ছয় সন্তানের মধ্যে কেশব ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁরা তিন ভাই এবং তিন বোন। কেশব যখন মাত্র তেরো বছরের, তখন তাঁর পিতা-মাতা প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে একদিনে মারা যান। তাঁর দুই বড়ো দাদা, মহাদেব ও সীতারাম পন্ত তিনি যাতে সঠিক শিক্ষা পান তার ব্যবস্থা করেন। তাঁর বোনেদের নাম হলো সারু, রাজু এবং রঙ্গু। বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ হয়।

নাগপুর শহরের নীল সিটি হাইস্কুলে পড়ার সময় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কার করে। একবার, ব্রিটেনের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে নাগপুরে আতশবাজি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। যুবক কেশব তাঁর বন্ধুদের এই প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করে বলেন, 'একজন বিদেশি সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কোনো উৎসবে অংশগ্রহণ করা লজ্জার বিষয়।' রানি ভিক্টোরিয়ার রাজ্যারোহণের ডায়মন্ড জুবিলি পালনের বিরুদ্ধে রাগতস্বরে তিনি বলেন, 'তিনি আমাদের রানি নন।' তিনি তখন নিতান্তই বালক। স্কুল থেকে বহিষ্কারের ফলে তাঁকে পরবর্তীকালে পড়াশোনা করতে হয় ইয়তমলের রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে এবং পুনেতে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এককালের কংগ্রেস সদস্য এবং পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভার সর্ব ভারতীয় সভাপতি ডাঃ বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে তাঁকে ডাক্তারি পড়ার জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এল এম এস পাশ করেন এবং ১৯১৭-তে নাগপুরে ফিরে যান। প্রায় আট বছর তাঁর কলকাতায় অবস্থান তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো অধ্যায়। এই সময়কালেই তাঁর মধ্যে ভবিষ্যৎ 'রাষ্ট্রতপস্বী'র জন্ম হয়। এই সময়ে তিনি কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। এই অনুশীলন সমিতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রচনা বিশেষ করে তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শবাদ দ্বারাও অনুশীলন সমিতি প্রভাবিত হয়। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে তিনি বাঙ্গলার বিভিন্ন বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিভিন্ন বিপ্লবী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের মা কালীর সামনে গীতা হাতে শপথ গ্রহণ করতে হতো। ডাক্তার হেডগেওয়ারও একই দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অনুশীলন

সমিতির সদস্য হন। ডাক্তারজীর জীবনীকার বি ভি দেশপাণ্ডে এবং এস আর রামস্বামী তাঁদের গ্রন্থে বলেছেন, ''Each member on enrolment had to take a religious vow in the presence of ten or twelve people, or in the Kali temple or in the crematory.'' বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) তাঁর 'Thirty years in Prison' গ্রন্থে বারবার ডাঃ কেশবরাওয়ের উল্লেখ করেছেন। মহারাজ লিখেছেন, ''Nalinikishore Guha, author of the well-known book Banglar Biplob was a student of the National Medical College when Hedgewar too studied there. It was Guha who obtained entry for Hedgewar, Narayanrao Savarkar and others.'' তাঁর সঙ্গে কলকাতাতেই পরিচয় হয় বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), নলিনীকিশোর গুহ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মৌলানা লিয়াকত হুসেন, মতিলাল ঘোষ, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিপ্লবীদের সঙ্গে। ১৯১১ সালে 'দিল্লি দরবার' বয়কট আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। নলিনীকিশোর গুহ তাঁর 'বাঙ্গলার বিপ্লব' গ্রন্থে লিখেছেন, ''হেডগেওয়ার সর্বার্থেই ছিলেন একজন সত্যিকারের বিপ্লবী। তিনি সমিতিতে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং কাজের জন্য পরিচিত ছিলেন।'' তিনি তাঁর বিপ্লবী সহকর্মীদের কাছে 'কোকেন' নামে পরিচিত ছিলেন। যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর in Search of Freedom গ্রন্থে লিখেছেন যে ডাঃ হেডগেওয়ার অনুশীলন সমিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তিনি একাধিক বার ইংরেজদের কারাগারে বন্দি ছিলেন।

কিন্তু খুব কাছ থেকে কংগ্রেসের কার্যক্রম এবং তার রাজনীতি দেখে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ১৯২৩ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তাঁকে বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য করে। ভারতীয় জাতি গঠনে তিনি বিকল্প পথের অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। এই সময় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এবং বিপ্লবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের রচনা অধ্যয়ন করে তার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। তিনি অনুভব করেন, ভারতীয় হিন্দুদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় জাতীয়তার উন্মেষ ঘটাতে হবে। বাঙ্গলায় অবস্থান তাঁর মধ্যে স্বদেশ ও হিন্দু সমাজপ্রীতির ভিত্তি রচনা করে। অনুশীলন সমিতির হিন্দুধর্ম অনুশীলন তাঁর মধ্যে বিশেষ স্থান করে নেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাক্তারজী এবং দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর মনন তৈরি করে দিয়েছিল তাঁদের কলকাতা এবং সারগাছি অবস্থানকাল। যাইহোক, ১৯১৭ সালে ডাক্তারি পাশ করে নাগপুরে ফিরে যান ডাক্তার হেডগেওয়ার। নাগপুরে ফিরে তিনি কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা উভয় দলেরই সদস্য হন। দুটি দলের নীতিগত বিভেদ তখনও ততটা প্রকাশ্যে আসেনি। মদনমোহন মালব্য, বি এস মুঞ্জে, লালা লাজপত রাই প্রমুখ কংগ্রেস নেতা একই সঙ্গে মহাসভা এবং কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। এঁরাই মহাসভাকে সক্রিয় সহযোগিতা করতেন। তিনি গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৩০ সালে জঙ্গল সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। তিনি ব্যক্তি হিসেবে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠন হিসেবে সঙ্ঘকে অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেই গড়ে তোলেন। তাঁর প্রবর্তিত এই পদ্ধতি তাঁর পরবর্তী সরসঙ্ঘচালকগণও বজায় রাখেন। যাইহোক, তখনও অবধি কংগ্রেস ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতি ও কার্যক্রম স্থির করত। কিন্তু কংগ্রেসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রাদুর্ভাব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মহাসভা এবং কংগ্রেসের মধ্যে এই সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে পড়ে। তুরস্কে খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য খিলাফত আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস-মহাসভা সম্পর্কের কফিনে শেষ পেরেকটি পুতে দেয়। গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্ত বেশিরভাগ হিন্দু নেতাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। এই সময়েই নাগপুরে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে এক ভয়াবহ 'হিন্দু-মুসলমান' দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এই দাঙ্গার তাৎক্ষণিক প্রভাব এবং স্থায়ী সমাধান খুঁজতে গিয়েই তাঁর মাথায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা মনে হয়। এই দাঙ্গার পরে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর আবার নাগপুরে হাজার হাজার মুসলমানের সশস্ত্র মিছিলে 'আল্লাহ্ আকবর', 'দ্বীন দ্বীন' ইত্যাদি ধ্বনিসহ এক মারমুখী মিছিল বেরোয় নাগপুরে। এই মিছিল হিন্দুদের মনে প্রচণ্ড আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মিছিল থেকে নানা প্ররোচনামূলক স্লোগনের ফলে এক ভয়ংকর দাঙ্গা হয়। তিনদিন ধরে এই দাঙ্গা চলে। এইসব ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত এবং শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর, বিজয়াদশমীর পুণ্যতিথিতে নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্ঘের সূচনায় ডাক্তারজী ছাড়াও ডাঃ বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে, বীর সাভারকরের ভাই গণেশ দামোদর সাভারকর, এল ভি পরাঞ্জপে বি বি থোলকর উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এই পাঁচজন উপস্থিত থাকলেও ডাক্তারজীই ছিলেন মূল প্রেরণা এবং সংগঠক। সঙ্ঘের প্রথমযুগের স্বয়ংসেবকদের মধ্যে ছিলেন ভাইয়াজী দানী, বাবসাহেব আপ্তে, মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর, মধুকর দত্তাত্রেয় দেওরস (বালাসাহেব দেওরস), মধুকররাও ভগবত প্রমুখ স্বয়ংসেবক। সেই সময়ে মহারাষ্ট্রে হিন্দু মহাসভা গুরুত্ব দিয়েছিল রাজনৈতিক কার্যকলাপে আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নিয়োজিত হলো হিন্দু সমাজের সামাজিক সংহতি ও উন্নয়নের কাজে। সঙ্ঘ নিজেকে নিয়োজিত করল শুধু বৌদ্ধিক নয়, স্বয়ংসেবকদের শারীরিক বিকাশেও। বৌদ্ধিক এবং শারীরিক বিকাশের মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে সংহত করে এক অজেয় সমাজ ও দেশ গঠন করাই ডাক্তারজীর লক্ষ্য ছিল। হিন্দু সংগঠনের কাজকে ডাক্তারজী মাত্র দুটি শব্দবন্ধের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করেছেন, প্রথমত, সঙ্ঘকাজ দৈবী কাজ, এবং দ্বিতীয়ত, সঙ্ঘকাজ রাষ্ট্রীয়কাজ। আর এই দৈবী কাজের জন্য তিনি এক শৈলী নির্মাণ করেন— 'শাখা'। প্রতিদিনকার শাখার মাধ্যমে, স্বামী বিবেকানন্দ যাকে বলেছিলেন, ম্যান মেকিং অর্থাৎ মানুষ তৈরি করার কাজ, তাই শুরু করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কাজের মানুষ। তাঁর দর্শন ছিল একাগ্র নিষ্ঠা, দুর্লভ চরিত্র, অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা এবং আদর্শের প্রতি নিবেদিত এক অতুলনীয় প্রত্যয়ে আস্থাবান ছিলেন যে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবেই। দধীচির মতোই তিনি তাঁর জীবন দেশ ও হিন্দু সমাজের কল্যাণে সমর্পণ করেছেন। ডাঃ হেডগেওয়ার লোকান্তরিত হলে বিনায়ক দামোদর সাভারকর বলেছিলেন, 'হেডগেওয়ার স্বর্গত, হেডগেওয়ার অমর রহে।'

(বর্ষ প্রতিপদ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

ভারতকে ভালোবেসেছিলেন শার্লোট ক্যানিং

কৌশিক রায়

ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষে রাজপুরুষদের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁদের স্ত্রী-কন্যা- ভগিনীরা। এঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের পুরুষদের মতো এই দেশের 'নেটিভ' ও 'কালা আদমি'দের ঘৃণা করতেন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশিত হতো সেইসব শ্বেতাঙ্গিনীর লেখায় ও কথাবার্তায়। তবুও, মাদাম বেলনস ও টিলি কেট্‌ল-এর মতো শ্বেতাঙ্গিনীরা তাঁদের সুচারু তৈলচিত্রের মাধ্যমে অমর করে রেখেছেন সেকালের কলকাতার গঙ্গার ঘাট, গড়ের মাঠ এবং স্থানীয় মানুষদের জীবনচর্যাকে। এরকমই একজন শ্বেতাঙ্গিনী ছিলেন শার্লোট ক্যানিং। তিনি প্রথম ভাইসরয়— লর্ড ক্যানিংয়ের স্ত্রী ছিলেন। ভারতের লোকজীবন এবং সমাজ-রাজনীতির একটি সজীব চিত্র শার্লোট ক্যানিং (স্টুয়ার্ট) লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তাঁর লেখা ও ছবিতে। সম্প্রতি, লেডি ক্যানিংয়ের (যার নামে 'লেডিকেনি' মিষ্টান্নটির নামকরণও হয়েছে) এই ভারতদর্শনের অভিজ্ঞতা আর ভারতপ্রেম নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ— 'স্কেচেস ফ্রম আ হাওদা : শার্লোট লেডি ক্যানিংস ট্যুরস।'

যৌবনকালের প্রথমদিকে মহারানির ভিক্টোরিয়ার অন্যতম সহকারিণী বা লেডি অব দ্য বেডচেম্বার হিসেবে কাজ করেছিলেন শার্লোট। এর ফলে মহারানি ও তাঁর স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট-এর মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি আর জনমানস সম্পর্কে আরো বেশি করে জানার সুযোগ পান বিদুষী এবং অনুসন্ধিৎসু শার্লোট। ভারতের প্রতি এক মমত্ববোধও জেগে ওঠে তাঁর অন্তঃকরণে।

মহারানি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে একবার জার্মানিতে গিয়েছিলেন শার্লোট। তারপর, মহারানির উৎসাহে তিনি জনজীবন ও প্রকৃতি নিয়ে তৈল-মাধ্যমে ল্যান্ডস্কেপ এবং পোর্টেট ছবি আঁকতে শুরু করেন। ব্রিটিশ রাজদরবারে বেশ প্রশংসাও পায় শার্লোট-এর আঁকা ছবিগুলি। ১৮৬১ সালের সেপ্টেম্বর অবধি বেঁচে ছিলেন শার্লোট। ইংল্যান্ডের টেমস্ নদী আর ওক-পাইন গাছের স্নিগ্ধতায় বেড়ে ওঠা তাঁর শরীর এদেশের প্রখর দাবদাহ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ম্যালেরিয়া প্লেগ, বসন্ত, উদরাময়ের আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি। তবুও, এই স্বল্প সময়কালের মধ্যেই

শার্লোট লর্ড ক্যানিংয়ের সঙ্গে তাঁর রং-তুলি, ইজেল আর নোটবুক, কলম নিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি পাহাড়ে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড হয়ে পেশোয়ারে, হিমাচল ও গাড়োয়াল পর্বতাঞ্চলের তুষার ধবল রাজ্যে, দার্জিলিঙের মংপুতে এবং বাঙ্গলার শস্যশ্যামল গ্রামে-গ্রামান্তরে। 'পূর্ণিয়া ফিভার'-এ আক্রান্ত হয়ে পরলোকগতা হওয়ার আগের দিনেও শার্লোট ক্যানিং ভারতের ভূ-প্রকৃতি ও জনগোষ্ঠী নিয়ে ছবি এঁকেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। বারাণসী আর হরিদ্বার-এর দশাশ্বমেধ ঘাটে, মণিকর্ণিকা ঘাট, কাশীবিশ্বনাথ ঘাট আর হর-কি-পিয়ারী ঘাটর ওপর শার্লোট বেশ কয়েকটি তৈলচিত্র ও স্কেচ এঁকেছেন। এই ঘাটগুলিতে ধর্মাচরণ ও যাগযজ্ঞ সম্পর্কে তাঁর দিনলিপিগুলিও বেশ তথ্যমূলক এবং আগ্রহোদ্দীপক। ঝিলাম আর সিন্ধু নদের স্বচ্ছ, নির্বাধ প্রবাহ দেখে মুগ্ধ হয়ে শার্লোট ক্যানিং বলেছিলেন— টেমস, ভোল্গা, সীন-তিবের, নীপার, রাইন, ভিশচুলার মতো দীর্ঘাঙ্গী ইউরোপীয় নদীগুলি, সৌন্দর্যের নিরিখে ভারতীয় স্রোতস্বিনীদের কাছে কিছুই নয়। সহ্যাদ্রি, লুসাই পাহাড় আর নীলগিরি পর্বতাঞ্চলে শিল্পাঞ্চল ও বাসগৃহ তৈরি করার জন্য ইংরেজদের দ্বারা অবিরাম অরণ্য ধ্বংসের সরাসরি প্রতিবাদ করেছিলেন শার্লোট ক্যানিং। তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন— 'বনভূমির গুরুত্ব কী অমূল্য! তবুও তাকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে"— "Strange how little the forests are prized and how wantonly they are destroyed." উত্তরাখণ্ডের গাড়ওয়াল হিমালয়ের বনাঞ্চলে নির্বিচারে গাছ কাটা এবং গাছের ছাল ছাড়ানোর বিরুদ্ধেও আজকের সুন্দরলাল বহুগুনার মতোই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শার্লোট। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আগেই শার্লোট ক্যানিং বুঝতে পেরেছিলেন বৃক্ষদেবতাকে নির্মম আঘাত করলে সভ্যতার সংকট নেমে আসবেই। নর্মদা নদী দিয়ে নৌকাযোগে চলার সময়ে শার্লোট জব্বলপুরের মার্বেল বা শ্বেত মর্মর পাথরের সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়েছিলেন। ইংরেজ রাজপুরুষরা নিজেদের রাজকীয় বীরত্ব দেখানোর জন্য নির্বিচারে বনের ভয়ংকর সুন্দর বাঘকে গুলি করে হত্যা করুক, সেটা কখনোই চাইতেন না শার্লোট। শিমলিপাল, দুধওয়া, রনথম্ভোর, কাজিরাঙ্গার মতো এলাকাতে বাঘ এবং অন্যান্য বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্য গড়ে তোলার প্রস্তাব তিনিই দিয়েছিলেন। শার্লোটের রঙ তুলির টানে তাই বারংবারই সজীব হয়ে উঠেছে ভারতের বন্য প্রাণ এবং চিরশ্যামল প্রকৃতি।

পঞ্জাবের অমৃতসর এবং ফাগওয়ারা শহরে শিখ রাজবংশের জাঁকজমকের বর্ণনা, দিনলিপিতে দিয়েছেন শার্লোট ক্যানিং। তবে, শিখধর্ম যে গুরুনানক দেব, গুরু রামদাস, গুরু গোবিন্দ সিংহের অনাড়ম্বর এবং অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমের ওপর দাঁড়িয়ে আছে— সেটির উল্লেখ করতে তিনি ভোলেননি।

ইংরেজ সৈন্যরা ভারতীয় সৈন্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে যে হেয় এবং বিদ্রূপ করে সেটা মোটেই সহ্য করতে পারেনি শার্লোট ক্যানিংয়ের কোমল ও মানবপ্রেমিক হৃদয়। মহাবিদ্রোহের একটি অন্যতম কারণ যে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে সুযোগসুবিধা ও বেতনক্রমের তারতম্য— সেটা বহুবার উল্লেখ করেছেন ব্রিটিশ ভারতের এই প্রথম ভাইসরেইন। ভারতীয়দের তিনি মনের আবেগ দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁর লেখা ও রেখাতে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

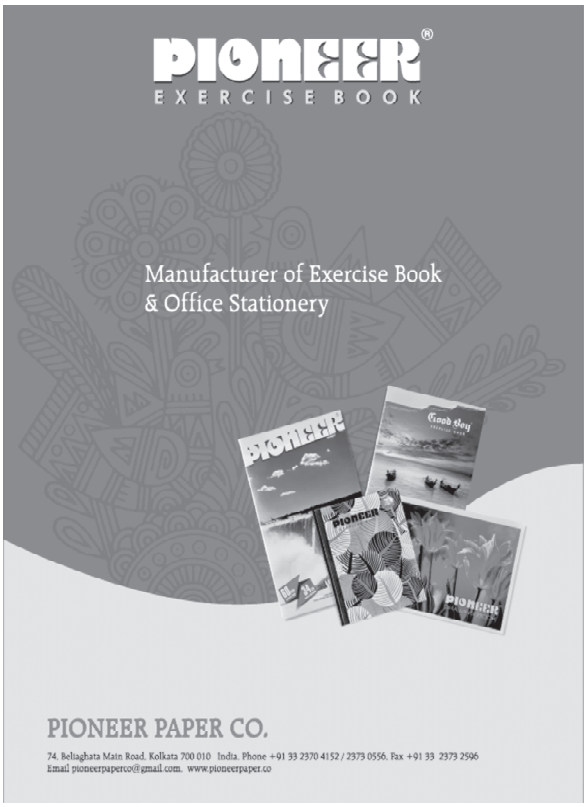

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

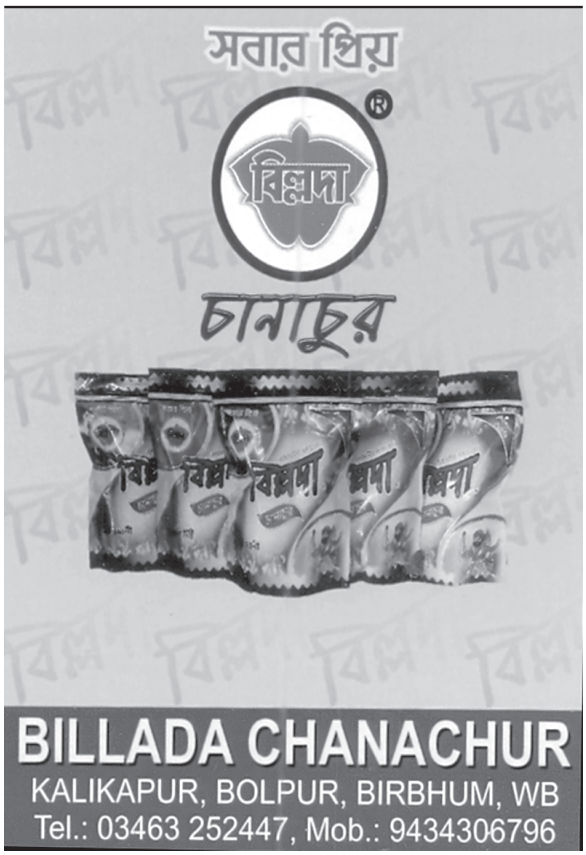

চোরেদের পিকনিক

গৌতম কুমার মণ্ডল

শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। পৌষের মাঝামাঝি। বছর কয়েক আগেও গ্রামগঞ্জের ছেলে-মেয়েরা এই সময় দল বেঁধে পৌষালু করতে যেত। সে পৌষালুর মজাই ছিল আলাদা। নিজেদের সাইকেলের ক্যারিয়ারে কাঠ আর হাঁড়ি-কুড়ি বেঁধে সবাই দল বেঁধে চলে যেত কাছের ক্ষেত-মাঠের কোনো নিরিবিলি জায়গায়। সেখানে হয়তো ছোট্ট নদী বইছে তির তির করে। পাড়ে কয়েকটা বাবলা, পলাশ, কুল বা সেরকমই কোনো ছোটো গাছের নিবিড় ছায়া। তার তলাতেই ইট পাথর দিয়ে তৈরি হলো উনুন। মেয়েরা নদী থেকে জল নিয়ে এল। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির তলাটায় নদীর কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে বসিয়ে দিল ভাত। আর হ্যাঁ; দলেরই কেউ কেউ নিজের বাড়ির হাঁস বা পায়রা ধরে নিয়ে এসেছে থলিতে। তাদের মেরে ছাল ছাড়িয়ে পরিপাটি করে মাংস শালপাতায় সাজিয়ে নিয়ে এল কোনো ওস্তাদ কিশোর। এই মাংসের গরম ঝোল, দু'এক টুকরো মাংস, বাঁধাকপির তরকারি আর শেষে এক হাতা করে বিলাতির চাটনি। এই তো ছিল পৌষালুর খাবার। মাঠে সারাদিন হইচই, নদীর বালিতে খেলা, জলে স্নান, এদিক ওদিক বেড়ানো, পেটপুরে খাওয়া আর পড়ন্ত বিকেলে সবকিছু আবার সাইকেলে বেঁধে দল বেঁধে ক্লান্ত পায়ে বাড়ি ফিরে আসা— পৌষালুর মজাই ছিল আলাদা।

দিন ক্রমশ পাল্টে গেল। পৌষালু এখন আর নেই। এখন পিকনিক। এখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে কয়েকটি পিকনিক স্পট। সেখানে দূরদূরান্তের লোকেরা আসেন। ডিসেম্বর-জানুয়ারির সময়টায় এই সব জায়গায় লেগে যায় পিকনিকের ধুম। বাস গাড়িতে ভরে যায় এলাকা। গাড়ি রাখারই যেন জায়গা পাওয়া যায় না। পিকনিকের রান্নাবান্না বা বসে খাওয়ার জন্য সুন্দর প্রশস্ত জায়গার জোগাড় করাই যেন একটি বড়ো ঝামেলার কাজ। পিকনিক পার্টিকে প্রথমেই গিয়ে এই জায়গা খোঁজার কাজ করতে হয়। তারপর হাঁড়ি-কুড়ি নামাও, গ্যাস সিলিন্ডার নামাও আর লাগিয়ে দাও সাউন্ড সিস্টেম। ডি জে হলে তো কথাই নেই। যত পার্টি তত গান, তত হই হট্টগোল, তত কলরব। তা হোক কলরব। বছরের এক আধটা দিন বই তো নয়। এই সব কলরব দেখে কঁচিকাঁচাদের মন বিগড়ে যায়। তারাও যেতে চায় পিকনিক। এই যেমন আমাদের ভরতপুর গ্রামের অনন্ত বাদ্যিকরের আট ক্লাসে পড়া ছেলের শুশুনিয়ার পিকনিক দেখে মন বিগড়ে গেল। ঘরে এসে বাপকে বলল— 'বাবা চল আমরাও পিকনিকে যাই।'

শুশুনিয়ার অদূরেই ছোটো গ্রাম ভরতপুর। তপশিলি জাতি আর বনবাসী মানুষদেরই বাস এ গ্রামে। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে মাটির দেওয়াল আর টিনের চালার ছোট্ট ঘর অনন্ত বাদ্যিকরের। অনন্তের জমিজমা খুব সামান্যই। যা আছে তাও বাইদ জমি। আর বাঁকুড়ার এই টাঁড় ঊষর ডাঙ্গায় দু'এক কাঠা বাইদ জমিতে হবেই বা কী! তাই আমাদের বাঁকুড়ার এই

অনন্ত যেন গরিবের থেকে আরও গরিব। ছোটোলোক অপেক্ষা আরও ছোটোলোক। কিন্তু তাই বলে সে হাল ছাড়েনি। ছেলাটা আট কিলাসে পড়ে। বউটার হরেক রকম বায়নাক্কা। সব খরচ সে বহন করে। সংসারের খরচ সামলাতে সে মাঝেমধ্যে চুরিও করে। হ্যাঁ, আসল কথাটা হলো অনন্ত বাদ্যিকর এ এলাকার এক নামি চোর। আশপাশের কুলটুকা, গয়েসপুর, ঘোড়ামুলি গ্রামের দু'একজনও তার সঙ্গে চুরি করতে যায়। তবে সেই হলো চোরেদের সর্দার। সবাই মোটামুটি ছিঁচকে চোর। বড়ো চুরি বা ডাকাতিতে তারা হাত দেয় না।

শুশুনিয়ার পাহাড়তলিতে পিকনিকের বহর দেখে অনন্তের একমাত্র ছেলে বৈদ্যনাথেরও একদিন পিকনিক করতে মন যায়। পাহাড়তলিতে ঘুরতে গিয়েছিল সে আর তার এক বন্ধু। সেই বন্ধুও গিয়ে বাপকে বলে পিকনিকে যাবার কথা। বৈদ্যনাথ বাপকে এসে বলে— 'শুশুনিয়ায় পিকনিকের খুব ধুম লেগেছে বাবা। নানাদিক থেকে কত লোক এসেছে। মেলা বসেছে। কত গাড়ি, কত বাস। কলকাতার বাবুদের ছেলে-মেয়েরা লাল নীল হলুদ সোয়েটার আর টুপিতে পাহাড়তলিকে প্রায় রঙিন করে তুলেছে। তোমার তো চুরি করতেই জীবনটা গেল। একদিন চল না পিকনিক করতে যাই আমরাও?'

বিপদে পড়ল অনন্ত। একে অভাবের সংসার। তার উপরে পিকনিক! ছেলেকে বোঝাল সে— 'পিকনিক! ওসব বাবুভায়াদের মজার জিনিস। আমাদের কী আর পিকনিক করা সাজে! তুই বুঝি দেখ্যে আলি পিকনিক করা!

কিন্তু না। ছেলের সঙ্গে এবার ছেলের মা-ও বায়না ধরল সেও যাবে বিকনিক করতে। স্বামীকে সে বলল— 'চল না একদিন উখানে। ধারার জলে রাঁধাবাড়া কর্য়ে খাঁয়্যে আসব। ছোটোবেলায় সেই পৌষালু কর্য়েছিলাম। এখনকার পিকনিক মানে তো পৌষালু। পৌষমাসে একদিন বাইরে যাঁইয়ে খাইতে হয়। চল কেনে। ছেল্যাটার কথা শুন।'

অনন্তর বিপদ আরো বাড়ল। পিকনিকের কত খরচ! সে কোথায় পাবে? এখন তো আর পৌষালু নাই যে ঘরের দু'টা হাঁস পায়রা ধরে নিয়ে গিয়ে বনভোজন করে আসব। এখন পিকনিক। তার মেলা ঝামেলা। খরচ আর ঝামেলার কথা মাথায় নিয়ে সে গেল কুলটুকার ফড়িং তাঁতির ঘর। ফড়িং তার এক নম্বর সাগরেদ। সে কোনো কাজ করে না অনন্তের পরামর্শ ছাড়া। শরীরের মতো বুদ্ধিটাও তার নড়বড়ে। অনন্ত যা বলে তাতেই তার হ্যাঁ। মনে কোনো প্যাঁচ নেই ফড়িঙের। অনন্ত ফড়িঙের ঘরে গিয়ে দেখে তারও ছেলে আর বউ পিকনিকের জন্য হাঙ্গামা জুড়েছে। সিধা সরল ফড়িংকে একেবারে জ্বালিয়ে খাচ্ছে তারা।

ছেলে-বউয়ের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত অনন্ত আর ফড়িং সিদ্ধান্ত নিল তারাও পিকনিক যাবে। কিন্তু টাকা কোথায়! দু'জনের ক্ষুদ্র বৈঠকে তারও সমাধান হয়ে গেল। ফড়িং মাংসের দায়িত্ব নিল। আর চাল ডাল তেল মশলা-সহ সবজিপাতির দায়িত্ব নিল অনন্ত। কে কীভাবে সেসব মহার্ঘ্য জিনিস সংগ্রহ করবে তারও নকশা তৈরি করে ফেলল। এরকম বহু নকশা তারা আগে তৈরি করেছে এবং কখনো কোনো গোলযোগ দেখা দেয়নি। ঠিক হলো ফড়িং নিজেরই গ্রামের বিনু তাঁতির গোয়াল থেকে একটা ছোটো পাঁঠা বার করে নিয়ে আসবে ঠিক পিকনিকের আগের রাতে। আর অনন্ত হয় কুলটুকা না হয় গয়েসপুর সুবিধামতো কোনো গাঁয়ের একটা মুদির দোকান থেকে চাল ডাল তেল মশলাপাতি চুরি করবে ওই পিকনিকের আগের রাতেই। শুশুনিয়ায় যেতে যেতে পথের ধারের দু'পাশে গুড়পুতার তেলিদের সবজির ক্ষেত। যাবার সময় দু'টা বাঁধাকপি আর কিছু বিলাতি তুলে গামছায় বেঁধে নিলেই হলো। সে কাজটা অনন্তই করবে। সুতরাং সমস্যার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ! নিজেদের বউ-বাচ্চাকে এসব পরিকল্পনার কথা বলার কোনো দরকার নেই। পিকনিকে যাবার জন্যও কারো ঘরে চুরি করতে হবে— এসব ভাবনায় হয়তো তারা দুঃখ পেতে পারে। ছেলেদুটা তো স্কুলে যায়। আট না নয় ক্লাসে দুটোই একসঙ্গে পড়ে। তাদের মনে এখন নানা ভাবনা। চুরি তারা করতে চায় না, চুরির কথা শুনতে চায় না। দিন দিন বউদুটাও যেন ছেলেদের দিকেই যাচ্ছে। বলে চুরি করা নাকি পাপ কাজ! শুনলে গা জ্বলে যায়!

পরিকল্পনা সাঙ্গ করে বেশ খুশিমনে ঘরে ফিরে এল অনন্ত। পিকনিকের দিনও ঠিক করে ফেলল একটা। আসলে ছেলেই দিনটা ঠিক করল। আসছে পয়লা জানুয়ারি। নতুন বছর। সেদিন প্রচুর লোকজন আসবে শুশুনিয়ায়। তারাও সেদিনই যাবে পিকনিক করতে। শুশুনিয়ার পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনার জল শেষে বাঘের মুখ থেকে পড়ে। তারা দু'চারজন বন্ধু সে জলে বহুবার স্নান করেছে। এবার যাবে পিকনিকে। ওই জল নিয়েই হবে রান্না। শুধু কি পিকনিক? সেদিন তো পাহাড়তলিতে মেলা বসে যায়। লাল-নীল-হলুদ কত বাহারি সোয়েটার আর টুপির মেলা। নাগরদোলা, বেলুন, বাঁশি, পার্কে ঘোরাঘুরি ও আরো কত কী। মনটা এখন থেকেই আনন্দে ডগমগ করতে থাকে অনন্ত আর ফড়িং দু'জনেরই ছেলে-বউয়ের। দিনটা কবে যে আসবে। আর যেন তর সয় না।

দিন অবশেষে এসে গেল। পয়লা জানুয়ারি। ইংরেজি নতুন বছর। তা ছেলেরা ওইসব ইংরেজি সালটাল বোঝে। অনন্ত ফড়িং বোঝে বাংলা সাল। তবে এখন ছেলেদেরই দিন। তাদের কথাই শুনতে হয়। তাই পয়লা জানুয়ারি পিকনিক। দিনটাও এসে গেল। সকালে উঠেই সাইকেলে কাঠ হাঁড়িকুড়ি বেঁধে ফেলেছে অনন্তের ছেলে। ঠিক আছে কুলটুকা থেকে চলে যাবে ফড়িঙের ছেলে-বউ। পাঁঠা নিয়ে যাবে ফড়িং।

কিন্তু শুরুতেই গোলোযোগ। অনন্ত আর ফড়িং কারো কিছুই চুরি করা হয়নি। একে তো দিন কয়েক আগের পরিকল্পনার কথা তাদের ঠিক মাথায় ছিল না। তার উপর পৌষের শীতের রাতে একা একা চুরি করার অভ্যাসও তাদের নেই। এই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় কাঁথা কম্বলে জড়সড় হয়ে রাতে কারোরই আর ঘুম ভাঙেনি। ফলে সকালে উঠেই দু'জন দু'গাঁয়ে প্রমাদ গুনছিল। কী হবে এরপর! শুধু কাঠ হাঁড়িকুড়ি নিয়ে গেলেই কি আর পিকনিক হবে! তবু বুকে সাহস রাখল দু'জনই। আসলে চোরের সাহস বলে কথা। অনন্ত তার বউয়ের নানা প্রশ্নের উত্তরে জানাল সবকিছু নিয়ে যাবে ফড়িং। আর ফড়িং তার বউয়ের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে জানাল সব ব্যবস্থা করেছে অনন্ত। আমাদের ভাববার কিছু দরকারই নেই। শুধু সাইকেলে কিছু কাঠ আর কড়াই খুন্তি হাতা আর পাতা নিয়ে গেলেই হলো। সুতরাং আর কোনো পক্ষে কোনো সংশয় নেই। নিশ্চিন্তে দুই দল দুটো সাইকেলের ক্যারিয়ারে কাঠ আর হাঁড়িকুড়ি বেঁধে নিয়ে চলল শুশুনিয়ায়।

শুশুনিয়ার পথে কিছুদূর এসেই দুই দলে দেখা। দুই বউয়ের সে কী ভাব আর হাসি আর আনন্দ। কতদিন গরিবের সংসারের জাঁতাকলে হাঁপিয়ে উঠে এই একদিনের জন্য যেন তাদের পৌষালুর আনন্দ। আনন্দ মুক্তির। দু'জনেরই মনে পড়ছিল ছোটোবেলায় ফেলে আসা পৌষালুর দু'একটি দিন। কতদিন কেটে গেল জীবন! দ্রুত পায়ে চলছিল দুই বউ। যেন ছুটছিল। দুই ছেলের হাতে সাইকেল। দু'জনেরই ক্যারিয়ারে বাঁধা কাঠ, হাঁড়িকুড়ি; হ্যান্ডেলের দু'একটি থলিতে বঁটি, হাতাখুন্তি ও আরও কত কী। ছেলেরা মায়েদের আগে আগে সাইকেল ঠেলে হাঁটছে। এত জিনিসপত্তর সাইকেলে যে হেঁটে হেঁটে যাওয়াই ভালো। দুই বাপ অনন্ত আর ফড়িং খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। ছেলে আর বউদের আনন্দ দেখে তারাও খানিকটা আনন্দই করতে চাইছে। কিন্তু উদ্বেগ যেন পিছু ছাড়ছে না। সরলমতি ফড়িং-ই আগে বলল সমস্যার কথাটা। তার পাঁঠা চুরি করা হয়নি। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফড়িঙের কথায় সাহস পেয়ে অনন্ত জানাল তারও মুদির দোকানে চুরি করা হয়নি। শীতের রাতে তারও ঘুম ভাঙেনি।

এখন কী উপায়! এইসব ভাবতে ভাবতে দুই বন্ধু যেন পিছিয়ে পড়ছিল। তাদের পা যেন আর চলেই না। বউ-ছেলেরা একবার পিছন ফিরে তাকায়ও না। তাদের যেন দরকারই নেই আর। পথে যেতে যেতে রাস্তার ধারের ক্ষেত থেকে দুটো বাঁধাকপি আর কয়েকটা বিলাতি তুলে গামছায় বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে অনন্ত। আপাতত এই তাদের পিকনিকের জোগাড়। বাদবাকিটা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না অনন্ত। অন্যদিকে ভাবনার ভার ফড়িং অনন্তকেই দিয়ে দিয়েছে। সে খানিকটা নিরুদ্বিগ্ন। সে ভাবছে অনন্ত যখন আছে কিন্তু একটা হবেই। আর অনন্ত ভাবছে হাসি খুশি বউ-ছেলেদের বহু লোকের পিকনিকের হুল্লোড়ের মাঝে গিয়ে কী অবস্থাটাই না হবে! তাদের হাসি তো আর একটু পরেই কান্নায় বদলে যাবে। ছেলে-বউয়েরা কী বলবে তাকে! সে কী করবে! এইসব ভাবতে ভাবতে টলমল পায়ে হাঁটছিল অনন্ত। কাঁধের গামছায় দুটো বাঁধাকপি আর কয়েকটা বিলাতি।

সকাল সকাল শুশুনিয়ায় গিয়ে বেশ সুন্দর একটা জায়গাও দখল করেছে দুই বউ আর দুই ছেলে। সাইকেল থেকে নামানো হয়েছে কাঠ, থলে, হাঁড়িকুড়ি। পাথর দিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছে উনুন। জ্বালানোটাই শুধু বাকি। এই সময় কোনো রকমে এল দুই বন্ধু। বাঁধাকপি আর বিলাতি বাঁধা গামছাটা ধপাস করে নামিয়ে বসে পড়ল অনন্ত। তার পাশেই বসল ফড়িং। দুই বউ হাঁড়ি নিয়ে চলে গিয়েছে ধারার জল আনতে। ছেলেরা শুকনো কাঠগুলিকে হাতেই ভেঙে ছোটো ছোটো করছিল।

বসে বসে দুই বন্ধু দেখছিল চারপাশটা। কত কত বাবুভায়ারা কত দূরদূরান্ত থেকে এসেছে। কত টাকা এদের! কত বড়ো বড়ো লোক এরা! সবাই ফুর্তি করতে এসেছে। আর হুই দেখ! তাদের কাছেই একটা দল মাইক বাজিয়ে নাচতে শুরু করেছে। ছ্যা ছ্যা করে উঠল অনন্তর মন। পেটমোটা বাবুদের কী নাচ! সঙ্গে মাইয়া-বউয়েরাও লাচ করছে। লাজ সরম নাই ইয়াদের। ফড়িং তাকে দেখিয়ে দিল—

'হুই দেখ দাদা! ই শালারা মদ খাইচ্ছে। ওই দেখ বোতল।'

অনন্ত বুঝতে পারল ইয়ারা সবাই মাতাল। একটু দূরেই তাদের বাস দাঁড় করানো আছে।

হঠাৎ অনন্তের মাথায় চোরের বুদ্ধির বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। সে তড়াক করে উঠে পড়ল। পড়ে থাকা থলেটা লুঙ্গিতে গুঁজে নিয়ে ফড়িঙের হাতটা ধরে বলল আয়। তারপর দ্রুত এই পিকনিক পার্টির বাসের কাছে গেল দু'জন। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া ময়লা জামা। গলায় গামছা। প্রায় জীর্ণ বেশ। চারদিক দেখে নিয়ে অনন্ত আর ফড়িং বাসের দরজাটা টেনে উঠে পড়ল বাসে। উঠেই তাদের চক্ষু যেন চড়কগাছ। বাস ফাঁকা। কেউ নেই। না ড্রাইভার না খালাসি। বাসের মেঝেতে একটা বড়ো কড়াইয়ে রাখা আছে চাল, ডাল, মশলাপাতি, তেলের বোতল। আর হুই দেখ। শালপাতায় মোড়া কেজি পাঁচেক পাঁঠার মাংস। সঙ্গে নিয়ে আসা থলেতে সব চটপট নিয়ে নিল অনন্ত— চাল ডাল মশলাপাতি তেলের বোতল। শালপাতা সমেত মাংসটা গামছায় বাঁধল ফড়িং। তারপর দ্রুত নেমে গেল। নিমেষের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করে ফিরে এল দুই বন্ধু। এদিকে জল নিয়ে বউয়েরা ফিরে এসেছে। ছেলেরা উনুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। দরকার মতো সব থলে থেকে বার করল অনন্ত। বাকি জিনিস রয়ে গেল থলেতেই। সেই থলেটা সাইকেলের হ্যান্ডেলে পুরে স্নান করার অছিলায় দুই বন্ধু সরে পড়ল। অন্যদিকে পাশের পার্টিটার নাচ তখন আরও জমে উঠেছে।

ফড়িং স্নান করে নিল একটা চেনা পুকুরে। আর সাইকেল চালিয়ে দ্রুত ঘরে গেল অনন্ত। চুরির বাদবাকি মাল ঘরে রেখে দিয়ে আসাই ভালো। তারপর এই পুকুরে এসেই ডুব দিল।

ঘণ্টা খানেক পরে স্নানপর্ব সমাধা করে ফিরে এল দুই বন্ধু। এখন তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খানিকটা ভদ্র বেশ। তেল চপচপে মাথায় টেরি কাটা। এসেই বউদের উপর হম্বিতম্বি। এখনো রান্না হয়নি! ছেলেদের ধমক দিল কাঠগুলো ভালো নয়। কাঁচা। তাই ভালো জ্বলছে না। ফড়িং তো বউকে প্রায় সরিয়ে দিয়ে নিজেই মাংস নাড়তে শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়ার পর এক টুকরো মাংস অনন্তকে দিয়ে বলল—

'দেখ তো দাদা নুনটা ঠিক হয়েছে কিনা।'

অনন্ত মাংসের টুকরোটা মুখে নিয়েই বলল— 'একদম ঠিক। নুন ঝাল সব ঠিক। সিদ্ধও হয়ে গেছে। নামিয়ে দে।'

তারপর খেতে বসল সবাই। ফড়িংয়ের বউ ভাত ডাল তরকরি দিল। মাংস দিল অনন্তের বউ। তারপর নিজেরাও বসে পড়ল। গরম ভাত। মুগের ডাল। টাটকা বাঁধাকপির তরকারি। পাঁপড়। এক হাতা করে বিলাতির চাটনি। আর হ্যাঁ, সবার শেষে দুটো করে বড়ো বড়ো নলেন গুড়ের রসগোল্লা।

অন্যদিকে নেশা খানিকটা কেটে যাওয়ার পর পাশের পার্টির লোকেরা তাদের গাড়িতে যখন গেল তখন কিছুতেই তাদের হিসাব মিলছিল না। কী হলো কেউ কিছু বুঝতে পারছিল না। এ ওকে দোষ দেয়, সে তাকে। খানিকক্ষণ হৈ হল্লার পর আরও একবার মদ খেয়ে নিল তারা। তারপর কেউ কেউ গেল হোটেলে। অনেকের আর খাবার দরকারই পড়ল না। খানিক পরেই তাদের গাড়ি ছেড়ে দিল।

ক্রমশ বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমে এল। দুই বউ বাঁধাছাঁদা করে বাগিয়ে গুছিয়ে সব সাইকেলে তুলে নিল। তারা সবাই মনের আনন্দে একটা দিন কাটিয়ে বাড়ির পথ ধরল। দুই বউয়ের আবারও মনে পড়ল কতদিন আগের ফেলে আসা পৌষালুর দু'একটি দিনের কথা। ■

কলকাতা বন্দরের নামকরণ বিতর্ক

বিমলেন্দু ঘোষ

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে কলকাতা বন্দরের নামকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজ্যের কংগ্রেস এবং বাম নেতারা সরব। সম্প্রতি এক বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত তাঁদের আপত্তিগুলি খতিয়ে দেখা যাক।

কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সোমেন মিত্রের অভিযোগ— শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় যুবকদের অন্তর্ভুক্তিতে সাহায্য করেছিলেন। তা তিনি অবশ্যই করেছিলেন এবং জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে। সেনাবাহিনীতে হিন্দু যুবকদের যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। হিন্দু যুবকরা সেনাবাহিনীতে যোগদানের আবেদন উপেক্ষা করলে, বা তা না করলে তার পরিণতি কী হতে পারে তা তাঁর দূরদর্শী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার ও ব্যাখ্যা করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন— "If Hindus refuse this offer either on the plea of Congress non-violence, or non-cooperation, Government would not wait for them, but would either recruit Muslims or non-Hindus or bring foreign troops from abroad. On the other hand, if Hindus in large numbers were militarised, they would not only gain in skill, discipline and experience, but would one day able to serve the country's cause - either as the National Army of a free India or as an army that might revolt and made India free. In fact, we gave expression to these sentiments in public while we advocate a policy of militarisation"। শ্যামাপ্রসাদের ওই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল বীর সাভারকরের কণ্ঠে। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে সাভারকর ঘোষণা করেছিলেন— 'আজই হোক আর কালই হোক, ইংরেজকে এদেশ ছাড়তেই হবে। ক্ষমতার লড়াই হবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে। যদি হিন্দু সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, তবে স্বরাজ পেলেও তা রক্ষা করা যাবে না।' স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সায়গন রেডিও থেকে সাভারকরের নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন— "Of all Indian leaders I congratulate Veer Savarkar for his far-sighted policy of Militarisation"। উল্লেখ্য, যুদ্ধের শুরুতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাত্র ৩৩ ভাগ হিন্দু ছিল। ওই নীতির ফলে যুদ্ধাবসানে হয়েছিল শতকরা ৭২ ভাগ হিন্দু। অপরপক্ষে, ইতিহাসের সেই মহাসন্ধিক্ষণে কংগ্রেসের ভূমিকা কী ছিল? ৩ সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ৯.৯.১৯৩৯ তারিখে 'হরিজন'-এ গান্ধীজী লিখলেন— ''আমি এখন কেবল ভারত উদ্ধারের কথা ভাবছি না। সেটা হবে, কিন্তু তার কি মূল্য থাকবে, যদি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পতন হয়...।" পণ্ডিত নেহরু তাঁর বিবৃতিতে ব্রিটেনের প্রতি শুধু সহানুভূতি জানিয়েই খান্ত হয়নি, তিনি বললেন--- ''ব্রিটেনের অসুবিধার থেকে নিজেদের সুবিধা বার করে নেওয়াটা আমাদের দৃষ্টিতে সমস্যা সমাধানের পথ হবে না।..." (দি স্টেটসম্যান, ১০.৯৬৩৯)। ১৯৪০ সালের ২০ মে নেহরুর অপর একটি বিবৃতি ছিল, ''ব্রিটেন যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যস্ত, সেই সময় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভারতের সম্মান খর্ব করবে।...." এবং গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল, ''ব্রিটেনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই না। এটা অহিংসার পথ নয়।"

বলা বাহুল্য, শ্যামাপ্রসাদের অগ্রাধিকার ছিল জাতীয় স্বার্থ, আর জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রাধিকার ছিল শাসক ব্রিটিশ রাজশক্তির স্বার্থ। সোমেনবাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ— শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুদের জন্য আলাদা দেশের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মিত্র মহাশয় বুল বকেছেন। আলাদা দেশ নয়, শ্যামাপ্রসাদের প্রস্তাব ছিল, দেশভাগ করতে হলে বাংলাও ভাগ করতে হবে। তাঁর ওই প্রস্তাব অযৌক্তিক ছিল না। সর্দার প্যাটেলের এক পত্র তার প্রমাণ। ১৯৪৭ সালের ১৩ মে সর্দার প্যাটেল কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস সদস্য ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগীকে লিখেছিলেন— "I am afraid that the cry of sovereign Bengal is a trap in which even Kiran Shankar may fall with Sarat Babu. The only way to save the Hindus of Bengal is to insist on Partition of Bengal"।

সোমেনবাবুর তৃতীয় অভিযোগ— যখন কংগ্রেস লিগকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন শ্যামাপ্রসাদ লিগের সঙ্গে বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সোমেনবাবুর ইতিহাসজ্ঞান বিস্ময়কর। মুসলিম লিগকে নয়, কংগ্রেস ফজলুল হককে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠন করে বাংলায় মুসলিম লিগের প্রবল প্রতিপত্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফজলুল হক তাঁর একক ব্যক্তিত্বের জোরে ৩৯টি আসন পেয়েছিলেন। মুসলিম লিগ পেয়েছিল ৪০টি আসন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৬০টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ফজলুল হক বাংলার রাজনীতি থেকে মুসলিম লিগের ধর্মীয় রাজনীতিকে চূর্ণ করার জন্য কংগ্রেসের সাহায্যে সরকার গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত ছিল, কংগ্রেস কোনো প্রদেশেই কারোর সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে যাবে না। কংগ্রেসের প্রত্যাখ্যানের ফলে অনন্যোপায় ফজলুল হক মুসলিম লিগকে নিয়ে সরকার গঠনে বাধ্য হয়েছিলেন। ইতিহাস বলবে, সেদিন কংগ্রেসের অদূরদর্শী হঠকারী সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে বাংলায় মুসলিম লিগের আধিপত্য সুগম করে দিয়েছিল।

সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী একই গীত গেয়েছেন। বলেছেন, বন্দরের অধীনে নেতাজী সুভাষ ডক আছে অনেকদিন থেকে। বন্দরের নাম বদল করে নেতাজী সুভাষের উপরে শ্যামাপ্রসাদের নাম চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য--- ''বাংলার যে ইতিহাস উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমৃদ্ধ, সেখানে প্রথমজন বিপ্লবী। আর দ্বিতীয়জন উপনিবেশিক শাসকের সহায়ক, বাংলা ভাগের উদ্‌গাতা।"

সুজনবাবুকে কী স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, তাঁরা 'জনযুদ্ধ' ধুয়া তুলে ঔপনিবেশিক শাসককুলের সহায়ক হয়েছিলেন, 'পাকিস্তান দিতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে' জিগির তুলে সোচ্চার হয়েছিলেন, এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ বসুকে 'তোজোর কুকুর' বলেছিলেন?

■

ওড়িশায় আন্তর্জাতিক মানের হাই পারফরমেন্স সেন্টার

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব ক্রীড়াবৃত্তে দেশকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ওড়িশায় গড়ে উঠেছে নানা খেলার হাই পারফরমেন্স সেন্টার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের ঐকান্তিক ইচ্ছে ও উদ্যোগের ফসল হিসেবে এই সেন্টার ইতিমধ্যেই গোটা দুনিয়ার ক্রীড়া সংস্কৃতির মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। তাই ওড়িশায় এখন পরপর বিশ্ব হকির বড়ো বড়ো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আর হাই পারফরমেন্স ডেভোলপমেন্ট সেন্টার গড়ে তুলে ওড়িশা বুঝিয়ে দিয়েছে তারা বাকি দেশের থেকে চিন্তা-চেতনায় অনেক এগিয়ে। ভবিষ্যতে অলিম্পিয়াডের জন্য ভারতীয় অ্যাথলিট ক্রীড়াবিদরা এই সেন্টারেই প্রশিক্ষণ নিয়ে উড়ে যাবেন বিশ্বমঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে।

খেলা ও শরীরচর্চায় উন্নত প্রথম বিশ্বের দেশগুলিতে যে মডেলে এই ধরনের হাই পারফরমেন্স সেন্টার গড়ে উঠেছে ঠিক সেই আঙ্গিক ও গঠনকাঠামো নিয়ে তৈরি হয়েছে ওড়িশার হাইপারফরমেন্স সেন্টার অব এক্সেলেন্স। নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে এই সেন্টারের কোচেরা উদীয়মান কুঁড়িদের চয়ন করে আনেন, তারপর উন্নত আধুনিক প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞানভিত্তিক ট্রেনিং, সুষম ও পরিমিত ডায়েট, ভিডিয়োতে দেশ-বিদেশের উন্নত খেলোয়াড়দের ট্রেনিং পদ্ধতি বিশ্লেষণ, ক্রীড়া বিজ্ঞানের সহয়তা প্রদান, বেসিক এডুকেশনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের তৈরি করা হয়। সাই, টাটা অ্যাকাডেমির থেকে এক কদম এগিয়ে এই সেন্টার। প্রথমে ২০১৯-র ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব অলিম্পিকে একমাত্র ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রার নিজস্ব ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শুটিংয়ের হাইপারফরমেন্স সেন্টার গড়ে ওঠে। এই প্রকল্পের গতি প্রকৃতি দেখে উৎসাহিত হয়ে প্রখ্যাত ক্রিকেটার অনিল কুম্বলের টেনভিক স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস এবং কেজিএস আলুওয়ালির গ্রুপ ভারোত্তোলনে কাজ শুরু করে। এরপর টাটা স্টিমের সঙ্গে হকি, এ আই এফ এফ ও জে এন ডব্লু যৌথ উদ্যোগে ফুটবল, একই গ্রুপের উদ্যোগে সাঁতারের হাইপারফরমেন্স সেন্টারের পথ চলা শুরু। মাউন্টেনিয়ারিং ও অন্যান্য অ্যাডভেঞ্চার গেমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশন। আম্বনিদের রিলায়েন্স গোষ্ঠী এগিয়ে এসেছে 'মাদার অব অল গেমস' অ্যাথলেটিক্সের উন্নয়নে।

ওয়েটলিফটিং হাইপারফরমেন্স সেন্টারে এই মুহূর্তে ট্রেনিং ও কোচিং নিচ্ছে সারা দেশের বাছাই করা ৩৫ জন ভারোত্তোলক। ইরানের প্রাক্তন অলিম্পিক ও বিশ্বসেরা ভারোত্তোলক কাজিম পাঞ্জারির কাছ থেকে আধুনিক ভারোত্তোলনের সমস্ত কলাকৌশল শিখে নিচ্ছে। সম্প্রতি জাতীয় ওপেন মিটে এদের মধ্যে ১১ জন ভারোত্তোলক

৫ সোনা ৪ রূপো, ১ ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিয়েছে। ভবিষ্যতে এই সেন্টার থেকে আরো বেশি সংখ্যায় শুধু জাতীয় পর্যায়েই নয়, আন্তর্জাতিক মিট থেকেও একাধিক পদক আসবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড হাইপারফরমেন্স সেন্টারের দায়িত্বে আছেন ইউরেপের নামি কোচ ব্রিটিশার জেমস হিলেরিয়ামস। ইউরোপ, আমেরিকায় যেসব অ্যাকাডেমি বা ট্রেনিং সেন্টার চলে, তার সঙ্গে তুলনীয় এই সেন্টার। একেবারে তৃণমূলস্তর থেকে যেভাবে গড়ে তোলা হয় অ্যাথলিট প্রতিভাদের, তারপর ধাপে ধাপে পরিমার্জিত হয় ট্রেনিং পদ্ধতি। ঠিক সেভাবেই প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গত বছর জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ১৬ জন অ্যাথলিট ৪ সোনা-সহ ৩৮টি পদক জিতেছে। বিশ্ব পট্টনায়ক সাঁতার সেন্টারে ৩০ জন সাঁতারু প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এদের মধ্যে ১৬ জনকে তৈরি করা হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক আসরের উপযোগী করে তোলার জন্য। বাকি ১৫ জনকে প্রাক প্রতিযোগী প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে।

রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় এদের মধ্যে অনেকেই পদক জিতেছে। সাঁতারের পুলগুলি একেবারে আধুনিক ইকোসিস্টেম মেনে করা হয়েছে। প্রতিদিন জল পরিষ্কার করা হয়। প্রি সুইমিং কন্ডিশনিং, রি-হ্যাব কন্ডিশনিং, ম্যাসাজ সব কিছু আধুনিক মানের। অন্যদিকে হকির হাই পারফরমেন্স সেন্টার নিজের চোখে দেখার পর মনে হয়েছে ভবিষ্যতে ভারত যদি বিশ্ব হকির হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পায় তার পিছনে বড়ো ভূমিকা থাকবে এই সেন্টারের। সম্প্রতি বিশ্ব হকি লিগে নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়ার মতো মহাশক্তিধর দেশের সঙ্গে যে খেলা খেলেছে ভারত, তাতে আশাবাদী হওয়াই যায়। এই সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুফল পাচ্ছে ভারতীয় খেলোড়ারা। বিশেষ করে জুনিয়র ও সাবজুনিয়র স্তরে যে ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা একেবারে সঠিক দিশাযুক্ত। এভাবেই হকি বিশ্বে উন্নত দেশগুলি নিজেদের তৈরি করে বড়ো লড়াইয়ের জন্য। নেদারল্যান্ডের প্রাক্তন বিশ্ববন্দিত খেলোয়াড় ফ্লোরিস বোভেল্যান্ডারের নিজস্ব অ্যাকাডেমি বোভেল্যান্ডার অ্যাকাডেমির টেকনিকাল পার্টনার। ফুটবলে আই লিগ খেলা ইন্ডিয়ান অ্যারোজ ও জাতীয় অনূর্ধ্ব ১৬ দল এই সেন্টারে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। এছাড়া রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেদের নিয়ে আসা হয়েছে ভবিষ্যতে জাতীয় দলকে সমৃদ্ধ করার লক্ষে। শুটিংয়ে ওড়িশা ট্যালেন্ট অ্যাডপসন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। অভিনব বিন্দ্রা, যশপাল রানা, রাজ্যবর্ধন রাঠেরের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সফল শুটাররা এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত। সেন্টারের উদ্যোগে নানা অঞ্চলে ক্যাম্প করা হয়। সেখান থেকে উদীয়মান ছেলে-মেয়েদের চয়ন করে আনা হয়। আর সেই সব প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পথ প্রশস্ত করাই এই সেন্টারের লক্ষ্য।

শিবের অনুগ্রহ

অনেক অনেক কাল আগে মহামুনি গৌতমের শ্বেত নামে এক বন্ধু ছিলেন। গৌতমী গঙ্গার তীরে তাঁর আশ্রম ছিল। তিনি

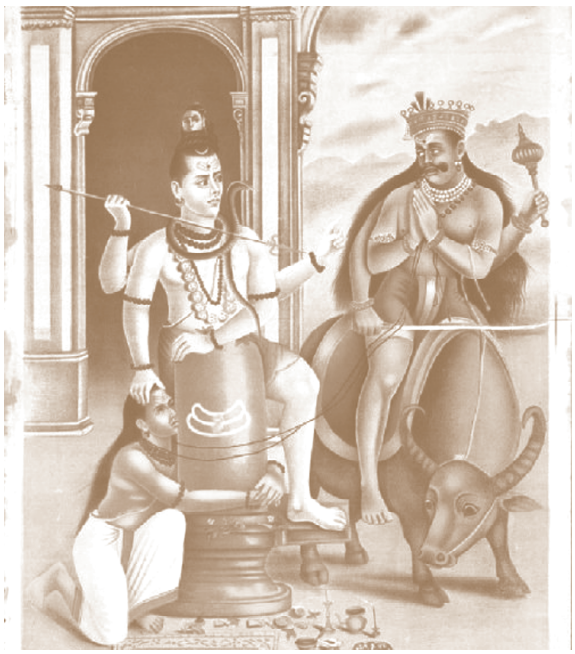

দেবাদিদেব মহাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। দিন-রাত তিনি শিবার্চনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন।

কালক্রমে তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে যমদূতেরা শ্বেতের বাড়িতে এল। কিন্তু তারা শ্বেতের বাড়িতে প্রবেশ করতে পারল না। ওদিকে মৃত্যুর সময় পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শ্বেতকে যমালয়ে উপস্থিত হতে না দেখে চিত্রগুপ্ত যমরাজকে বললেন, কী ব্যাপার অনুচরেরা এখনো শ্বেতকে নিয়ে হাজির হলো না! তাকে আনবার জন্য যাদের পাঠানো হয়েছে তারাও ফিরে এল না। এরকম নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া তো ঠিক নয়!

চিত্রগুপ্তের অনুযোগ শুনে যমরাজ তখনই তাঁর প্রধান অনুচর মৃত্যুকে শ্বেতের বাড়িতে যাওয়ার আদেশ দিলেন। নির্দেশ মতো মৃত্যু শ্বেতের বাড়িতে এসে দেখল যমদূতেরা শ্বেতের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। মৃত্যু বিস্মিত হয়ে এর কারণ জানতে চাইলে যমদূতেরা বলল, স্বয়ং মহাদেব শ্বেতকে রক্ষা করছেন, কাজেই আমরা তাঁর কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, তাঁর দীপ্ত তেজের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারছি না। তখন স্বয়ং মৃত্যু শ্বেতের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পেল শ্বেত বিভোর হয়ে শিবপূজা করছেন। ঘরে যে মৃত্যু হানা দিয়েছে সেদিকে তাঁর খেয়ালই নেই।

এদিকে মৃত্যুকে দেখতে পেয়ে মহাদেবের এক অনুচর বলে উঠল— কী ব্যাপার, তুমি এখানে কেন? শিবভক্তের ওপর তোমাদের তো কোনো অধিকার নেই। মৃত্যু তখন শিবানুচরকে বলল —শ্বেতের কাল পূর্ণ হয়েছে, তাই তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি। এই বলেই সে শ্বেতের দিকে পাশাস্ত্র নিক্ষেপ করল। মৃত্যুর এই গর্হিত আচরণ ও স্পর্ধায় শিবানুচর ক্রুদ্ধ হয়ে শিবদণ্ড দিয়ে মৃত্যুর মাথায় সজোরে আঘাত করল। সেই ভীষণ আঘাতে মৃত্যু মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মৃত্যুকে লুটিয়ে পড়তে দেখে যমদূতেরা ভীষণ ভয় পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে যমালয়ে ছুটে গিয়ে যমরাজের কাছে ঘটনার কথা নিবেদন করল। শিবানুচরের এহেন স্পর্ধায় যমরাজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে চিত্রগুপ্ত, মহিষ, বেতাল, আধি-ব্যাধি এবং কুক্ষি, অক্ষি ও কর্ণমূল তিন প্রকার জ্বর-সহ সমস্ত নরককে সঙ্গে নিয়ে শিবানুচরকে শাস্তি দেবার জন্য শ্বেতের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। এদিকে যমরাজকে সদলবলে আসতে দেকে সেই শিবানুচর সংবাদ পাঠিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গি, কার্তিক, গণেশ সাবইকে হাজির করানো।

শুরু হয়ে গেল ঘোরতর যুদ্ধ। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় যমদূতদের শরীর অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। এক সময় যমরাজকেও তিনি আহত করে ফেললেন। অবস্থা বেগতিক দেখে যমদূতেরা ছুটতে ছুটতে যমরাজের পিতা সূর্যদেবকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করল। তখন সূর্যদেব ব্রহ্মার কাছে গিয়ে সব ঘটনা জানালেন। ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাকে নিয়ে শ্বেতের বাড়ি হাজির হয়ে দেখলেন যমরাজ মর মর অবস্থায় পড়ে আছেন। চারদিকে সংবাদ প্রচার হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীর সবাই শেখানে হাজির হলো। দেবতারা তখন শিবের স্তুতি করে বললেন— দেবাদিদেব, ভক্তজনে অনুরাগ ও দুষ্টের দমনের ক্ষমতা সবই তোমাতে বিদ্যমান, আমরা তোমাকে প্রণাম জানাই। আমরা জানি শ্বেত তোমার পরম ভক্ত, কিন্তু তাঁর আয়ুষ্কাল শেষ হয়েছে। তবু দেবতাদের মিলিত শক্তি তাঁকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না, সে ক্ষেত্রে যমরাজের শক্তি তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ— তুমি ছাড়া শ্বেতের ব্যবস্থা বিধানে আর কে সমর্থ হবে?

দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, আপনারা যদি একটি শর্ত মানতে রাজি থাকেন তাহলে আমি অবশ্যই যমরাজকে ছেড়ে দিতে পারি। দেবতারা সমস্বরে সেই শর্ত পালনে সম্মত হলেন। মহাদেব বললেন, আমার শর্ত হলো শিবের ভক্তের কখনই মৃত্যু হবে না। দেবতারা বললেন— প্রভু, তাহলে তো সৃষ্টির নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। মহাদেব বললেন, তাহলে শোনো, যারা সৎভাবে জীবনযাপন করে নিত্য গঙ্গস্নান করে আমার পূজা করবে তাদের মৃত্যু স্পর্শ করলেও নরক ভোগ করেতে হবে না। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে দেবতারা মহাদেবের শর্তে রাজি হলেন। তখন মহাদেব সবাইকে সুস্থ করে দিলেন। সেই থেকে পরম শিবভক্তকে নরক ভোগ করতে হয় না।

শ্যামাপদ সরকার

ভারতের পথে পথে

বৈজনাথ

কাংড়া উপত্যকার শেষপ্রান্তে ১৩৬০ মিটার উচ্চতায় ছোট্টো শহর বৈজনাথ। একটু দূরে ধৌলাধার, সামনে আকাশপুরী রেঞ্জ। নীচে বয়ে চলেছে বিনোয়া নদী। জনশ্রুতি, এখানেও রয়েছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বৈদ্যনাথ শিব। অতীতের কিরানরামা বর্তমানে বৈজনাথ। বৈদ্যনাথ মন্দির চত্বরে আরও ১৬টি মন্দির রয়েছে। মন্দির ওড়িশার আদলে আমলক শিরে নাগারি শৈলীর। কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরের বিগ্রহও অতি সুন্দর। প্রবেশপথের কুলুঙ্গিতে রয়েছে গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, সূর্য, চামুণ্ডা, কার্তিকেয়, নন্দী ছাড়াও নানান দেব-দেবার মূর্তি। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, মন্দিরটি পাণ্ডবভ্রাতারা তৈরি করেন। শিবরাত্রিতে এখানে জাঁকালো উৎসব হয়।

জানো কি?

বিভিন্ন দেশের জাতীয় খেলা

- ভারত ও পাকিস্তান— হকি।
- বাংলাদেশ— কাবাডি • ভুটান —ধনুর্বিদ্যা বা তিরন্দাজি।
- শ্রীলঙ্কা ও নেপাল — ভলিবল।
- ইন্দোনেশিয়া ও মালেশিয়া — ব্যাডমিন্টন।
- চীন — টেবিল টেনিস।
- আমেরিকা — বেসবল। • কানাডা — আইস হকি। • স্পেন, ইতালি পোল্যান্ড — ষাঁড়ের লড়াই।
- ব্রাজিল ও ফ্রান্স — ফুটবল।
- ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া — ক্রিকেট। নিউজিল্যান্ড— রাগবি ইউনিয়ন।

ভালো কথা

পরিবেশ বাঁচতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পরিবেশ নিয়ে সকলেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন এটটা বোঝা যায়। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগে সবাইকে এগিয়ে আসতে খুবই কম দেখা যায়। কলকাতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলি এবার বাস্তব প্রয়োগে আক্ষরিক অর্থেই এগিয়ে এসেছে। তাদের সবকটির প্রবেশ দ্বারের সামনে ঝুলছে প্ল্যাকার্ডে 'নো প্লাস্টিক ব্যাগ' । এবার সরস্বতী পুজোয় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থার্মোকল কিংবা প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার হয়নি। এছাড়াও তারা পরিবশ বাঁচাতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জিডি বিড়লা ইনস্টিটিউট তাদের দেওয়ালে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি নিয়েছে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ক্যাম্পাসে পুরোপুরি প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে। হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ১০০ কিলো ওয়াটের সৌর প্যানেল বসিয়েছে।। একটু অন্য রকমের উদ্যোগ নিয়েছে সাখওয়াত মেমোরিয়াল হাই স্কুল। গত শিক্ষক দিবসে ছাত্রীরা প্রত্যেক শিক্ষিকাকে গাছের বীজ উপহার দিয়েছে। কলকাতার পরিবেশ সচেতন মানুষেরা ছাত্র-ছাত্রীদের এই উদ্যোগের খুবই প্রংশসা করছেন।

সুদেষ্ণা ধর, একাদশ শ্রেণী, রাসবিহারী এভিনিউ, কল-১৯।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ত রা ল কা	(১) ন ন্ত কা ব লী স
(২) ধি ক না য়	(২) ন ভু ন মো ব হ

৯ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) অধিবেশন (২) পাগলপারা

৯ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) প্রকৃতিবিরুদ্ধ (২) বিক্ষোভমিছিল

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (২) অর্ঘকমল সাঁই, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (৪) শ্রেয়ান হালদার, বৈষ্ণবনগর, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২৮।।

প্রচণ্ড জ্বরের জন্য নাগপুর সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের রাতের কার্যক্রম মাঝপথে ছেড়ে ডাক্তারজীকে বাড়িতে ফিরে যেতে হলো।

এই অবস্থায় ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ডাক্তারজী উঠে বসে বললেন, চিকিৎসাশাস্ত্রে না হোন, আপনিও তো ডক্টর। আপনার মতো বড় ডক্টর আসামাত্রই জ্বর পালিয়েছে।

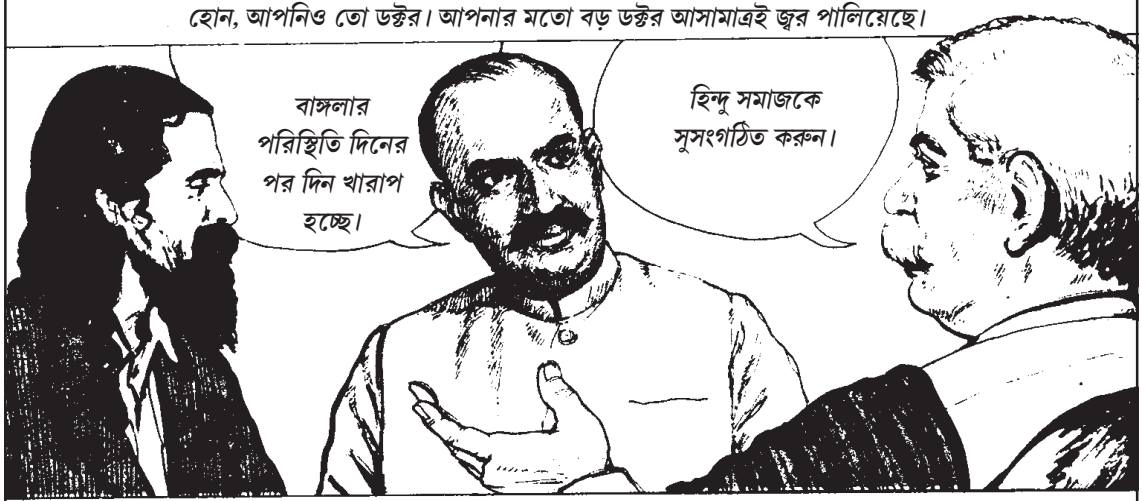

শ্রীগুরুজী ও অন্যান্য অধিকারীরা রোজই ডাক্তারজীকে বর্গের খবরাখবর জানাতেন। কিন্তু ডাক্তারজী তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে নিজেই যেতে চাইতেন।

বঙ্গবন্ধু একজন ঋষিতুল্য শান্তিদূত : মুজিববর্ষের উদ্বোধনী বার্তায় নরেন্দ্র মোদী

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমগ্র জীবন অনেক বড়ো প্রেরণা উল্লেখ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু মানে একজন সাহসী নেতা। একজন দৃঢ়চেতা মানুষ। একজন ঋষিতুল্য শান্তিদূত। একজন ন্যায়, সাম্য ও মর্যাদার রক্ষাকর্তা। একজন পাশবিকতাবিরোধী এবং যে কোনো জোরজুলুমের বিরুদ্ধে একজন ঢাল।

বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিন ও মুজিববর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাঠানো এক ভিডিয়ো বার্তায় বাংলাদেশের মানুষকে অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন মোদী। গত ১৭ মার্চ রাত আটটায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই বার্তা প্রচারিত হয়। নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আপনাদের ১৩০ কোটি ভারতীয় ভাই-বন্ধুদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভ কামনা।' বাংলাদেশে আসতে না পারার কারণ তুলে ধরে মোদী বলেন, 'শেখ হাসিনাজী আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এই ঐতিহাসিক সমারোহে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু করোনা ভাইরাসজনিত কারণে আমার পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পরে শেখ হাসিনাজী নিজেই একটি বিকল্প প্রস্তাব দেন এবং সে কারণে আমি এই ভিডিয়োর মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছি।'

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর জীবন একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের জন্য এক মহান বার্তা। আমরা সকলেই ভালো করে জানি, কীভাবে একটি নিপীড়ক ও দমনকারী সরকার সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উপেক্ষা করে 'বাংলা ভূমির' উপর অবিচারের রাজত্ব চালিয়ে জনগণের সর্বনাশ করেছিল। সে সময় যে ধ্বংসলীলা ও গণহত্যা হয়েছিল, সেই অবস্থা থেকে বাংলাদেশকে বের করে এনে একটি ইতিবাচক ও প্রগতিশীল সমাজে পরিণত করার জন্য তিনি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করেছিলেন।' মোদী আরও বলেন, 'বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন যে, ঘৃণা এবং নেতিবাচকতা কখনই কোনও দেশের উন্নয়নের ভিত্তি হতে পারে না। কিন্তু তার এই ধারণা এবং প্রচেষ্টা কিছু লোক পছন্দ করেনি এবং আমাদের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ এবং আমরা সকলেই ভাগ্যবন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা ঈশ্বরের আশীর্বাদে রক্ষা পেয়েছিলেন। নয়তো সহিংসতা এবং ঘৃণার সমর্থকরা চেষ্টার কোনো কমতি রাখেনি।'

বাংলাদেশের প্রশংসা করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণায় এবং শেখ হাসিনাজীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং উন্নয়নমুখী নীতিমালা অনুসরণ করে এগিয়ে চলছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অর্থনীতি থেকে শুরু করে অন্যান্য সামাজিক সূচক, যেমন—ক্রীড়াক্ষেত্র কিংবা দক্ষতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ক্ষমতায়ন, মাইক্রো ফিনান্সের মতো অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে।

নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আমি আনন্দিত যে, গত ৫.৬ বছরে ভারত এবং বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি সোনালি অধ্যায় রচনা করেছে এবং আমাদের অংশীদারিত্বকে নতুন মাত্রা এবং দিশা দিয়েছে। উভয় দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আস্থার কারণেই আমরা স্থল ও সমুদ্রসীমানার মতো জটিল সমস্যাগুলি সহজে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি। আজকে, বাংলাদেশ কেবল দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার নয়, উন্নয়ন অংশীদারও। ভারতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ বাড়িঘর এবং কারখানা আলোকিত করছে। বন্ধুরা, ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্কে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। সড়ক, রেল, বিমান, জলপথ বা ইন্টারনেট এমন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা দুই দেশের মানুষকে আরও বেশি সংযুক্ত করছে।'

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্ধুগণ, আমাদের যৌথ ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, লালন শাহ, জীবনানন্দ দাশ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতে মনীষীরা। বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার ও অনুপ্রেরণা আমাদের এই ঐতিহ্যকে আরও বিস্তৃত করেছে। তার আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে ভারত সর্বদা সংযুক্ত ছিল। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এই অভিন্ন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে। আমাদের এই ঐতিহ্য, আত্মিক বন্ধন, বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ, এই দশকেও দুই দেশের অংশীদারিত্ব, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির এক শক্তিশালী ভিত্তি।

নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আগামী বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ হবে এবং তার পরের বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী। আমার বিশ্বাস যে, এই দুটি মাইলফলক কেবল ভারত এবং বাংলাদেশের উন্নয়নকেই নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে না, দু'দেশের বন্ধনকেও জোরদার করবে। আবারও সমগ্র বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। জয় বাংলা, জয় হিন্দ।' ■

ফ ঃ ৬

দিল্লির হিংসার ষড়যন্ত্রীদের বিচারের আওতায় আনতে অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্র সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দিল্লিতে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনায় বহু জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশবাসীকে পুনরায় আশ্বস্ত করে বলেছেন, মোদী সরকার ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা রাজনৈতিক যোগ নির্বিশেষে ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে অঙ্গীকারবদ্ধ। রাজ্যসভায় আজ তিনি জোর দিয়ে বলেন, আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ক্ষতিগ্রস্তদের সুবিচার দেওয়া হবে। তিনি বলেন, হিংসাত্মক ঘটনায় যুক্ত কোনো ব্যক্তিকেই ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং এদের শাস্তিই ভবিষ্যতে হিংসার ঘটনায় জড়িত হবার আগে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করবে। শ্রী শাহ বলেন, যে কোনও ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা প্রতিহত করাই সরকারের অগ্রাধিকার। সেইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের সুবিচার নিশ্চিত করাও সরকারের কর্তব্য। দাঙ্গার সময় যারা সম্পত্তি নষ্ট করেছে, তাদের এই মাশুল দিতে হবে।

দাঙ্গার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে শ্রী শাহ সভায় জানান, এ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পওয়া ভিডিয়ো ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ১ হাজার ৯২২ জন ষড়যন্ত্রকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রসঙ্গে শ্রী শাহ বলেন, দিল্লি পুলিশ ষড়যন্ত্রকারীদের মুখাবয়ব যাচাইয়ের জন্য আধার তথ্য ব্যবহার করেনি। সরকার গোপনীয়তার অধিকারকে সম্মান দিয়ে থাকে জানিয়ে তিনি বলেন, দাঙ্গার ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে গোপনীয়তার অধিকারকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন দিল্লি পুলিশ গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের নীতি-নির্দেশিকাগুলি মেনে চলেছে। হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ৫০টি গুরুতর মামলার তদন্তের জন্য ডিআইজি এবং আইজি পদমর্যাদার আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে ৩টি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত গত ২৪ ফেব্রুয়ারির রাতে সিল করে দেওয়া হলেও পুরোপুরি সীমান্ত এলাকা বন্ধ করে দেওয়া কখনই সম্ভব নয় জানিয়ে শ্রী শাহ বলেন, দাঙ্গায় ব্যবহৃত অধিকাংশ আগ্নেয়াস্ত্র দেশে নির্মিত ও এগুলির কোনোটিরই লাইসেন্স ছিল না। অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারের দরুন ৪৯টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদন্তের ভিত্তিতে ৫২ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং দাঙ্গায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ১ হাজার ১০০-র-ও বেশি ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং দাঙ্গাবাজদের গ্রেপ্তারে ৪০টি দল গঠন করা হয়েছে। দাঙ্গায় আর্থিক মদত দেওয়ার অভিযোগে হাওলা লেনদেনে যুক্ত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, দাঙ্গার পেছনে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে।

ঘৃণা ও বিদ্বেষে প্ররোচনা দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে শ্রী শাহ জানান, স্পেশাল সেল বিষয়টির তদন্ত করে দেখছে। দাঙ্গা শুরু হওয়ার আগের দিন বেশ কিছু সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল এবং দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পর সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা দাঙ্গায় প্ররোচনা দিয়েছে, তাদের বিচারের আঙিনায় আনার ব্যাপারে তিনি দৃঢ় সংকল্পের কথা জানান। যে দু'জন ব্যক্তি দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার জন্য আইসিসের কাছ থেকে সংরক্ষণমূলক প্রচার-সামগ্রী পেয়েছিলেন, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমনকী, নিরাপত্তা বাহিনীর দুই কর্মী— হেড কন্সটেবল রতনলাল এবং গোয়েন্দা ব্যুরো'র আধিকারিক অঙ্কিত শর্মার হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও শ্রী শাহ জানান।

নিরপেক্ষ এক দাবদাওয়া কমিশন গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দিল্লি পুলিশ নিরপেক্ষ একজন বিচারপতি নিয়োগের জন্য দিল্লি হাইকোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তবে, বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। মোদী সরকার দাঙ্গার তদন্ত প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমগ্র তদন্ত প্রক্রিয়ার ন্যায়সঙ্গত সমাধান সুনিশ্চিত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে শ্রী শাহ বলেন, দাঙ্গায় জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি এক গুরুতর বিষয়। ছোটো একটি এলাকার মধ্যে হিংসাত্মক ঘটনাকে সীমিত রাখতে দিল্লি পুলিশ প্রশংসনীয় কাজ করেছে। তাই, পুলিশ বাহিনীর আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সিএএ সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করা হচ্ছে যে, সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। বিগত দু'মাস ধরে সিএএ-র বিরোধিতায় যে বিদ্বেষমূলক ভাষণ দেওয়া হয়েছে, তা ক্রমপুঞ্জিত হয়েই দিল্লিতে হিংসাত্মক রূপ নিয়েছে। দিল্লি হিংসার মামলাগুলির শুনানির সঙ্গে যুক্ত হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি বদলি প্রসঙ্গে শ্রী শাহ বলেন, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তবে, জনৈক বিচারপতি বদলির আগে তাঁর মতামত শোনা হবে।

জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (এনপিআর) প্রক্রিয়া পরিচালনার সময় কোনও নথিপত্র চাওয়া হবে না জানিয়ে সাধারণ মানুষকে পুনরায় আশ্বস্ত করে স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এনপিআর-এর ওপর ভিত্তি করে কোনও ব্যক্তিকে নাগরিকত্বের দিক থেকে সন্দেহজনক হিসাবে গণ্য করা হবে না। সিএএ এবং এনপিআর ইস্যুতে জনমানসে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর জন্য বিরোধিদের আহ্বান জানিয়ে শ্রী শাহ তাদের দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে পুলিশ প্রশাসনকে সাহায্য করতে বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনৈতিক দলগুলিকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের মন থেকে যাবতীয় ভীতি দূর করার অনুরোধ জানান। ■

সংক্রমণ প্রতিহত করতে পরামর্শ ও নীতি-নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিব আজ বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পরামর্শক্রমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা কার্যকর করার ওপর তিনি জোর দিন। তিনি বলেন, এই রোগের সংক্রমণ ঠেকাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের পৃথক নজরদারি ব্যবস্থা--- কোয়ারেনটাইন, হাসপাতাল ব্যবস্থপনা এবং সচেতনতামূলক প্রচারের মতো বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়।

কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে যুগ্মসচিব পর্যায়ের ৩০ জন নোডাল অফিসার কাজ করবেন। এরা বিভিন্ন রাজ্যে থাকবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে চলবেন। এই আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব সব মন্ত্রক ও দপ্তরের সচিবদের একটি চিঠিতে জানিয়েছেন, যে সমস্ত নির্দেশিকা ও পরামর্শগুলি জানানো হচ্ছে, সেগুলি যেন যথাযথভাবে পালন করা হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

গত ১১ ও ১৬ মার্চ ভ্রমণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা ছাড়াও আরও একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় আফগানিস্তান, ফিলিপিন্স ও মালয়েশিয়া থেকে যাত্রীদের ভারতে আসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই তিনটি দেশ থেকে ভারতীয় সময় বিকেল ৩টের পর আর কোনও বিমান ভারতে আসতে পারবে না। যদি কোনও বিমান এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তা হলে ওই বিমানটিকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নির্দেশ ৩১ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং তারপর এটিকে পুনর্বিবেচনা কর হবে।

এগুলি ছাড়াও আরও তিনটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, সেগুলি www.mohfw.gov.in —এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কোভিড-১৯-এর দ্রুত সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নীতি-নির্দেশিকার পরিবর্তন ও পরিমর্জন করা হয়েছে।

মৃতদেহ সৎকার সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও নতুন নীতি-নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলিকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আইসিএমআর-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, পরীক্ষাগারগুলিতে যোগ্য চিকিৎসক এই পরীক্ষা করতে পারবেন। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা সময়ে সময়ে পরিবর্তন করা হবে।

আইসিএমআর পরীক্ষাগারগুলির আদর্শ কার্যপরিচালন প্রণালী সংশ্লিষ্ট বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলিও মেনে চলবে। বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলি আইসিএমআর— পুণের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ভাইরোলজি স্বীকৃত উপকরণগুলি ব্যবহার করতে পারবে।

সন্দেহভাজন কারও শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করার সময় যথাযথ সুরক্ষা বজায় রাখতে হবে। বিকল্প হিসাবে এই নমুনাগুলি রাখার জন্য পৃথক জায়গার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সমস্ত বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলিকে রাজ্যের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে, যাতে আইসিএমআর- এর সদর দপ্তর গবেষণা প্রক্রিয়া বজায় রাখতে পারে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি কোনো কোনো মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের চিহ্নিত করা যেতে পারে।

আইসিএমআর কোভিড-১৯ পরীক্ষা নিখরচায় দপ্তর সমস্ত মন্ত্রক ও দপ্তরের কর্মীদের জন্য নীতি-নির্দেশিকা জারি করেছে।

সরকারি ভবনের প্রবেশদ্বারে থার্মাল স্ক্যানার বসাতে হবে এবং সেখানে হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা বাধ্যতামূলক। যাঁদের সর্দি-কাশির লক্ষণ দেখা যাবে, তাঁদের যথাযথ চিকিৎসা, কোয়ারেনটাইনের ব্যবস্থা রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অফিস চত্বরে ভিজিটর্স যাতে কম আসেন, সেই লক্ষ্যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভিজিটর্সদের সাময়িকভাবে পাস দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। যাঁরা অধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের যথাযথ অনুমতি পাবেন, তাঁদের স্ক্রিনিং-পর ঢুকতে দেওয়া হবে।

ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে যথাসম্ভব বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে। যে বৈঠকে অধিকমাত্রায় জনসমাগম হবে, সেগুলি প্রয়োজনে কম অথবা পরে করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

অফিসের কজে অহেতুক ভ্রমণ এড়াতে হবে।

অফিশিয়াল ই-মেলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফাইল এবং নথিপত্র আদান-প্রদন কমাতে বলা হয়েছে।

সরকারি ভবনের প্রবেশদ্বারে ডাক গ্রহণ করতে হবে।

সরকারি ভবনে থাকা সমস্ত জিম, বিনোদনকক্ষ এবং ক্রেশ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কর্মস্থলে নিয়মিত পরিচ্ছন্নত অভিযান ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। বাথরুমে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান এবং কলের জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সব আধিকারিকদের নিজেদের স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। যদি কারও শ্বাসকষ্ট ও জ্বরের লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং কর্মস্থল ছেড়ে চলে যাবেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী তিনি বাড়িতে পৃথকভাবে নজরদারিতে অর্থাৎ কোয়ারানটাইনে থাকবেন।

সাবধানতা অবলম্বনের জন্য কেউ ছুটি চাইলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ সেলফ কোয়ারানটাইনের সুযোগ দিতে হবে।

বয়স্ক, গর্ভবতী কর্মচারী এবং যাঁদের শারীরিক জটিলতা রয়েছে, তাঁদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। মন্ত্রক ও দপ্তরগুলি এই সমস্ত কর্মীদের জনসংযোগমূলক কাজ থেকে বিরত রাখবে।

জনৌষধি প্রকল্প সুলভে সেরা মানে ওষুধ যোগাবে— প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিয়ো কনফারেন্স করে ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনার সুফলভোগী এবং জনৌষধি কেন্দ্রগুলির দোকান মালিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনৌষধি দিবসকে কেবল একটি প্রকল্প উদ্‌যাপনের দিন হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং এই প্রকল্প থেকে লাভবান লক্ষ লক্ষ ভারতীয়র সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলার দিন হিসেবে দেখা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা প্রত্যেক ভারতীয়র সুস্বাস্থ্যের জন্য চারটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছি। প্রথমটি হল, প্রত্যেক ভারতীয়ের রোগমুক্তি। দ্বিতীয়, সব ধরনের রোগের সুলভে ভালো চিকিৎসা। তৃতীয়, আধুনিক পরিষেবা সম্বলিত হাসপাতাল, চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ভালো চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী সুনিশ্চিত করা এবং চতুর্থ, মিশন মোড ভিত্তিতে যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কাজ করা। শ্রীমোদী বলেন, জনৌষধি প্রকল্প দেশে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুলভে ভালো মানের চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র।

তিনি আরও বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে সারা দেশে ৬ হাজারেরও বেশি জনৌষধি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই ধরনের কেন্দ্রের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, যার সুফল আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এখন প্রতি মাসে ১ কোটির বেশি পরিবার জনৌষধি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সুলভে ওষুধপত্র পাচ্ছেন। বাজারের তুলনায় জনৌষধি কেন্দ্রগুলিতে ওষুধের দাম ৫০-৯০ শতাংশ কম বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত যে ওষুধের বাজার দাম প্রায় সাড়ে ৬ হাজার টাকা, তা জনৌষধি কেন্দ্রগুলিতে পাওয়া যায় কেবল ৮০০ টাকায়। আগের তুলনায় চিকিৎসার খরচ কমছে বলে অভিমত প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, জনৌষধি কেন্দ্রগুলির দরুন সারা দেশে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোটি কোটি মানুষ ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছেন। জনৌষধি কেন্দ্রগুলি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সব পক্ষের ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে পুরস্কার প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনৌষধি প্রকল্প ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের পাশাপাশি যুবাদের কাছেও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যম হয়ে উঠছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কুটুম্ব প্রবোধনের কার্যকর্তা ওমপ্রকাশ রাওয়াতের পিতৃদেব কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক মুসাদ্দিলাল রাওয়াত দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৭ মার্চ নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি ১ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, প্রয়াত রাওয়াত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চার্টার্ড অ্যাকান্ট্যান্ট ছিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালে গান্ধীহত্যার মিথ্যা অভিযোগে বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছিলেন। ১৯৯২ সালেও তিনি শ্রীরামমন্দির আন্দোলনে অংশ নিয়ে অযোধ্যায় করসেবায় গিয়েছিলেন।

* * *

নাগপুরের প্রয়াত স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন প্রচারক কালিদাস সালোড়করের ধর্মপত্নী বসুধা সালোড়কর গত ২৭ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি পুত্র বিনয়, নাতি অম্বরীশ সহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, শ্রী সালোড়কর মুর্শিদাবাদ জেলায় বেশ কয়েক বছর প্রচারক হিসেবে অতিবাহিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃতীয় বর্ষ করতে যাওয়া স্বয়ংসেবকদের সালোড়কর দম্পতি বহু বছর তাঁদের বাড়িতে সস্নেহে আপ্যায়ন করেছেন।

* * *

মালদা জেলার অমৃতি খণ্ডের পূর্বতন খণ্ডকার্যবাহ কৃষ্ণ মণ্ডলের বাবা বিভূতি মণ্ডল গত ৮ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

হাওড়া জেলার খলিসানি খণ্ডের বৌদ্ধিক প্রমুখ সুপ্রিয় মণ্ডলের মাতৃদেবী শান্তিময়ী মণ্ডল গত ১৩ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ট্রেন চলাচলে অভাবনীয় উন্নতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে ১০০ জোড়ার বেশি যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর এক তালিকা নীতি আয়োগ এবং ভারতীয় রেলের ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি) ২০১৯-এর ৪ অক্টোবর থেকে দিল্লি-লক্ষ্ণৌ তেজস এক্সপ্রেস ট্রেন চালাচ্ছে। এই ট্রেন চালু হওয়ার পর ২০১৯-এর ৪ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যেই আইআরসিটিসি প্রায় ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা আয় করেছে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিভিন্ন চাহিদার কথা মাথায় রেখে ভারতীয় রেল এই ধরনের একাধিক ট্রেন পরিষেবা চালু করেছে। গতিমান এক্সপ্রেস, বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনে আরও অত্যাধুনিক পরিষেবা চালু করা হয়েছে। রাজধানী, দুরন্ত, শতাব্দী এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনে পুরোপুরি সংরক্ষণ সুবিধা চালু হওয়ায় দূরের যাত্রীদের সুবিধে হয়েছে। অন্যান্য মেল, এক্সপ্রেস ট্রেন এবং অন্ত্যোদয় ট্রেন চালানো হচ্ছে। এছাড়াও, সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য। এতে উপকার পাচ্ছেন অসংরক্ষিত টিকিটের যাত্রীরাও। সংরক্ষিত শ্রেণীতেও প্রবীণ নাগরিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, ছাত্র-ছাত্রী, দিব্যাঙ্গজনদের ভাড়ায় ছাড় দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রেল প্রতিদিনই ট্রেন চলাচলে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি করে চলেছে। লোকসভায় সম্প্রতি এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় রেল, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে।

নতুন বস্ত্রনীতি গ্রহণ করল কেন্দ্রীয় সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সরকার বয়ন শিল্পে উন্নতি সাধনে নতুন বস্ত্র নীতি গ্রহণ করেছে। সমস্ত রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ই-পোর্টাল এবং বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তুলো, রেশম, পাট, পশম, হস্তচালিত তাঁত, বিদ্যুৎ চালিত তাঁত, তন্তু, বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, মানব সম্পদের মতো তথ্যগুলি বৃহত্তর স্বার্থে একত্রীকরণ করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে বস্ত্র শিল্প প্রযুক্তিগত সমস্যা, উৎপাদন খরচ এবং ঋণ পাওয়ার মতো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তাই বস্ত্র এবং অনুসারী শিল্প ক্ষেত্রগুলির উন্নতিসাধনে বৃদ্ধির জন্য আলাদা করে প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বস্ত্র শিল্পের আধুনিকীকরণে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্যই নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২০২২ সালের মধ্যে বস্ত্র শিল্পে ১ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং ৩৫ লক্ষ ৬২ হাজার কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। জাতীয় হস্তচালিত তাঁত উন্নয়ন কর্মসূচি, হস্তচালিত তাঁতিদের উন্নয়নে সহায়তাদন প্রকল্প, হস্তচলিত তাঁতি কল্যাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ চালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নে সহায়তাদান প্রকল্প, রেশম চাষের উন্নতিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাট চাষিদের আয় বৃদ্ধি এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক বস্ত্র উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা

হয়েছে। দেশে ৫৬টি বস্ত্র পার্ক গড়ে তোলার জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দুটি পার্ক গড়ে উঠবে। তার মধ্যে একটি কলকাতায় ইআইজিএমইএফ অ্যাপারাল পার্ক লিমিটেড। এর জন্য ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আর একটি পার্ক গড়ে উঠবে হাওড়ায়। সেটি হলো হোসিয়ারি টেক্সটাইল পার্ক। এর জন্য ২৮.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই দুটি পার্ক তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যসভায় সম্প্রতি এক লিখিত উত্তরে একথা জানান কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি।

সংসদে পাশ হলো খনিজ সংশোধনী বিল-২০২০

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংসদে সম্প্রতি পাশ হয়েছে খনিজ আইন সংশোধনী বিল, ২০২০। ১৯৫৭-র খনি এবং খনিজ (উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ) আইন এবং ২০১৫-র কয়লা খনি (বিশেষ সংস্থার) আইনে সংশোধনী এনে নতুন এই বিল পাশ হয়েছে। এই বিল পাশ হওয়ার ফলে ভারতে কয়লা এবং খনিজ ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। বিশেষ করে সহজে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে আরও সুবিধা হবে। কেন্দ্রীয় কয়লা এবং খনি মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, এই বিল দেশের খনিজ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে এবং কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিদেশ থেকে কয়লা আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে।

প্রতিরক্ষা বাহিনীতে মহিলাদের কাজের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে মহিলা আধিকারিকরা সাধারণত প্রযুক্তি শাখা, সিগনাল, আর্মি এয়ার ডিফেন্স, আর্মি সার্ভিস কোর, আর্মি অর্ডিনান্স কোর, ইলেট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্মি এডুকেশন কোর, জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল দপ্তর, গোয়েন্দা শাখা, আর্মি অ্যাভিয়েশন, আর্মি মেডিক্যাল কোর, আর্মি ডেন্টাল কোর এবং মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে কাজ করে থাকেন। ২০১৯-২০ থেকে মিলিটারি পুলিশের সিপাহি-সহ বিভিন্ন পদে প্রতি বছর ১০০ জন করে মহিলাকে নিয়োগ করা হচ্ছে।

২০২০-র ১৭ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী সরকার, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে শর্ট সার্ভিস কমিশনে মহিলা আধিকারিকদের পার্মানেন্ট কমিশনের বিষয়ে দায়বদ্ধ। প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী যোগ্যতা, কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা-সহ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে মহিলাদের সেখানে নিয়োগ করা হচ্ছে।

নৌবাহিনীতে বিভিন্ন পদে মহিলারা বর্তমানে কাজ করছেন। এখানে প্রশাসনিক পদ বলে কোনো পৃথক ব্যবস্থা থাকে না। নৌবাহিনীর ইউনিটগুলির মধ্যে কিছু ইউনিট সমুদ্রে কাজ করে, আর কিছু ইউনিট স্থলভাগে কাজ করে। মহিলারা ভারতীয় নৌবাহিনীর স্থলভাগে যেসব কাজ হয় সেখানেই নিয়োগ পেয়ে থাকেন। তবে নৌবাহিনীর এয়ার স্কোয়াড্রনে মহিলা আধিকারিকরা অভিযানে অংশ নেন এবং প্রয়োজনে অস্ত্রও চালান।

ভারতীয় বায়ুসেনায় শূন্যপদ, চাহিদা, শারীরিক সক্ষমতা এবং মেধার ওপর ভিত্তি করে মহিলাদের নিয়োগ করা হয়। এখানে মহিলারা প্রশাসনিক দায়িত্বও গ্রহণ করে থাকেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমরাস্ত্র সংক্রান্ত শাখাগুলি মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত নয়। নৌবহিনীতে মহিলারা মাঝ সমুদ্রে সংশ্লিষ্ট কাজগুলি যেমন— এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ, ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ব্রাঞ্চে যোগদান করতে পারেন না। বর্তমানে বায়ুসেনার এয়ারমেন পদটি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত। রাজ্যসভায় সম্প্রতি তিরুচি শিবার এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপাদ নায়েক।

পিএম কিষান মান ধন যোজনার আওতায় নাম নথিভুক্তিকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৯-এর ১২ সেপ্টেম্বর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বৃদ্ধ বয়সে সামাজিক সুরক্ষা দিতে সরকার প্রধানমন্ত্রী কিষান মান ধন যোজনা (পিএম-কেএমওয়াই) চালু করেছে। এই যোজনায় কৃষকরা ৬০ বছর বয়সের পর ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা পেনশন পাবেন। ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকরা, যাঁদের বয়স ১৮-৪০-এর মধ্যে, তাঁরা এই প্রকল্পে যোগদান করতে পারেন। যোগ্য কৃষকরা নিকটবর্তী কমন সার্ভিস সেন্টার অথবা রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মনোনীত পিএম-কিষাণ নোডাল অফিসারের কাছে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। কৃষকরা www.pmkmy.gov.in এই ওয়েব পোর্টালে গিয়েও তাঁদের বয়স অনুসারে ৫৫ থেকে ২০০ টাকা, প্রতি মাসে এই তহবিলে জমা দিতে পারেন। সমপরিমাণ অর্থ কেন্দ্র জমা দেবে। গত ১১ মার্চ পর্যন্ত ১৯,৯৭,৫৫৩ জন কৃষক এই প্রকল্পে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর এই তথ্য জানান।

উত্তর-পূর্বে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উত্তর পূর্বাঞ্চলে এসএআরডিপি-এনই প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্র সার্বিক সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় (প্রথম পর্যায় এবং অরুণাচল প্রদেশ) ৬৪১৮ কিলোমিটার রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কাজে খরচ ধরা হয়েছে ৩৩,৭৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩২২৫ কিলোমিটার রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে। ২১৫৫ কিলোমিটার অংশের সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে।

সড়ক পরিবহণ এবং মহসড়ক মন্ত্রক উত্তরাখণ্ডে চারধাম (কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রী) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৮৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় সড়কের মানোন্নয়নে ১১৭০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই ৮৮৯ কিলোমিটারের মধ্যে ১.১ কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ৬৪৬ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে।

মন্ত্রক, জাতীয় সড়কের বিস্তারিত পর্যালোচনার পর ভারতমালা পরিযোজনার প্রথম পর্বে ৩৪৮০০ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়নের জন্য ৫,৩৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বড়ো বড়ো মহাসড়কগুলির উন্নয়ন ঘটানো হবে। এছাড়া অর্থনৈতিক করিডর, অন্তর্বর্তী করিডর, ফিভার রোড, সীমান্ত এবং আন্তর্জাতিক সংযোগকারী এবং বন্দর ও উপকূলের মধ্যে যোগাযোগের সড়ক ও এক্সপ্রেসওয়ের উন্নয়ন ঘটানো হবে। ২০২০-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ ধরনের ১০, ১০০ কিলোমিটার সড়কের জন্য ২৪৬টি প্রকল্পের বরাত দেওয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ভারতমালা প্রকল্পে ১২৫৫ কিলোমিটার সড়ক তৈরি হয়েছে। রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন এবং মহাসড়ক মন্ত্রী নীতীন গড়করি।

দেশীয় প্রযুক্তিতে তিন চাকার বৈদ্যুতিক যান নির্মাণে আইআইটি খড়্গপুরের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আইআইটি খড়্গপুরের দেশলা বৈদ্যুতিক যান প্রকল্পে আইডিবিআই ট্রাস্টিশিপ সার্ভিস লিমিটেড কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় অর্থ জোগান দেবে। এই অর্থে তিন চাকার বৈদ্যুতিক গাড়ির উপযুক্ত হালকা ওজনের কাঠামো তৈরি করা হবে এবং গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরিতেও এই তহবিল থেকে সাহায্য পওয়া যাবে।

পেট্রোল, ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস বা তরল গ্যাসের মাধ্যমে যেসব গাড়ি চলে তাদের ইজিনের সঙ্গে বৈদ্যুতিক গাড়ির দামে যেন সাযুজ্য থাকে এবং এই গাড়িগুলি চালাতে যেন কম খরচ হয় সেই লক্ষ্যে গবেষণা করা হচ্ছে। এই গাড়িগুলির নকশা তৈরির সময় প্রচলিত গাড়ির যন্ত্রাংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এগুলির ওজন-সহ ব্যাটারি, মোটর কন্ট্রোলার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির দিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে।

আইআইটি খড়্গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক বিক্রান্ত রাচেরলা বলেন, আইডিবিআই ট্রাস্টিশিপের থেকে পাওয়া এই অর্থের সাহায্যে যে গাড়িগুলি তৈরি করা হবে সেগুলি যেন ঘণ্টায় প্রায় ৫০ কিলোমিটার বেগে যেতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। গাড়িগুলির চেসিস এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ নির্মাণে হালকা উপাদান ব্যবহার করার ব্যাপারেও খেয়াল রাখা হচ্ছে।

আইডিবিআই ট্রাস্টিশিপ সার্ভিসেস লিমিটেডের এমডি এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক স্বপন কুমার বাগচি বলেন, দেশে কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে দূষণের পরিমাণ কমাতে তারা পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

শ্রী বাগচি এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তনী। ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়টি চূড়ান্ত করেন।

করোনার প্রতিষেধক আবিষ্কার নিয়ে দুই দেশের ঠাণ্ডা লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার নিয়ে আমেরিকা এবং জার্মানির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, আমেরিকা চায় সারা বিশ্বের ঘুম কেড়ে নেওয়া করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িয়ে থাক তাদের নাম। আবার জার্মানিও চায় করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কারের দাবিদার হোক তাদের দেশ। দুই মহা ক্ষমতধর দেশের দ্বন্দ্বে ফাঁফরে পড়েছে জার্মান বায়োফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা কিওরভ্যাগ।

সংবাদ সংস্থা রয়টার জানিয়েছে, কিওরভ্যাক সাধারণভাবে মানব শরীরে সংক্রমণ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ে গবেষণা করে থাকে। সংস্থাটি সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য গবেষণা শুরু করেছিল এবং প্রতিষেধক আবিষ্কারের পথে সংস্থাটি অনেকদূর অগ্রসরও হয়েছিল। অভিযোগ, এরপরই মাঠে নেমে পড়ে আমেরিকা। জার্মান সংস্থাটিকে আমেরিকায় গিয়ে কাজ করার জন্য লোভনীয় অফার দেওয়া হয়। জার্মানির বিখ্যাত সংবাদপত্র ওয়েল্ট অ্যাস লেখে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিওরভ্যাককে লোভনীয় অফার দিয়েছেন। আবার সংস্থাটি যাতে জার্মানিতে থেকে গবেষণার কাজ করে তার জন্য জার্মান সরকারও তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো অফার দিয়েছে।

আমেরিকার পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করে এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, খবরের কাগজে খবরটা বিকৃতভাবে ছেপেছে। আমেরিকা যদি মনে করে কোনো সংস্থা বা কোনো ব্যক্তি বিশ্বকে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক থেকে বাঁচাতে পারবে তা হলে আমরা অবশ্যই তার সঙ্গে কথা বলব। অন্যদিকে জার্মান স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, জার্মান সরকার চায় করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক জার্মানি বা ইউরোপের কোনও দেশে তৈরি হোক। তার জন্য সরকার কিওরভ্যাককে সবরকম সুবিধে দেওয়ার জন্য তৈরি। জার্মান মন্ত্রীসভার সদস্য হর্সট সিফারও বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকার যে কমিটি গঠন করেছে সেখানেও কিওরভ্যাকের প্রসঙ্গটি আলোচিত হবে। কিওরভ্যাকের পক্ষ থেকে দাইমার হপ বলেন, আমরা কোনও একটি দেশকে নয়, সারা পৃথিবীকে সাহায্য করতে চাই। যদি সেটা জার্মানিতে থেকে সম্ভব হয় তা হলে আমরা খুশিই হব।

শব্দরূপ-৩ (বিষয় অভিমুখ—অনির্দিষ্ট) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

১	২	■	৩		৪	■	৫
৬		৭		■	৮	৯	
	■	১০		১১	■	১২	
১৩	১৪		■	১৫	১৬		■
■	১৭		১৮	■	১৯		২০
২১		■	২২	২৩		■	
২৪		২৫	■	২৬		২৭	
	■	২৮			■	২৯	

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. অন্ধকার রাত্রি খুঁজি,
৩. সরস ফল—আম্র বুঝি!
৬. ভক্তি যখন হরির উপর,
৮. 'বণিক' ধর, পাবে উত্তর।
১০. অন্য দিকে যখন মন,
১২. এবার তবে কর 'বর্জন'।
১৩. ঘরটি ভরাও 'রৌপ্য' দিয়ে
১৫. কালান্তক যম নাকি এ!
১৭. 'গভীরতা' মাপি নদীগর্ভে,
১৯. পর্বত গুহা দেখতে পাবে।
২১. বিনাশশীল...নশ্বর যা,
২২. তুলে ধর দৃষ্টান্তটা,
২৪. 'ন'-এর পরে কি যেন সে মৈত্রেয়ী দেবীর উপন্যাসে?
২৬. বন্দনার যোগ্য যিনি
২৮. জন্মদাতা পিতা ইনি
২৯. পক্ষ দু'টি, নেত্র ক'টি? দুই কক্ষে লেখ সেটি।

উপর-নীচ : ১. অহং ভাবখানা এ, **২.** মড়ক—শুনে মরছি ভয়ে! **৩.** রক্তবর্ণ...সে তো লাল-ই, **৪.** 'লইবে' যখন কথ্যে বলি। **৫.** কুম্ভমেলা এই স্থানেতেই, **৭.** ভবিষ্যতে যা ঘটবেই। **৯.** চৈতন্যদেবের এক ভক্তসঙ্গী, **১১.** ধ্বংস...বিনাশ-এর এর্থটি। **১৪.** ঘন সমাবেশ বহু মানুষের, **১৬.** ফুলের মধু—অর্থটি এর। **১৮.** সুরের বিস্তার—যা সংগীতে হয়, **২০.** বস্তুর উপাদান ও তার ধর্ম বিষয়। **২১.** মহান ব্যক্তির এই গুণ থাকে, **২৩.** বিম্বিসারের চিকিৎসক বলে জানি তাঁকে। **২৫.** দীপ্তি...আলো... বিক্রম—সবই, **২৭.** ধর্ম সঙ্গত বিধান-পাবি।

(● আগামী সংখ্যায় সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।)

প্রেরণার পাথেয়

হিন্দু সমাজকে নিজ হাতে নিজের কল্যাণ সাধনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাই সঙ্ঘের কাজ। আমাদের এক অদ্ভুত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে নিজেদের হিতাহিত চিন্তা না করিয়া আমরা অপরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ি। এই স্বভাবের পরিবর্তন না হইলে আমাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। হিন্দু সমাজের কল্যাণ করা মানে উহার নিজের রক্ষার দায়িত্ব নিজেকে পালন করিতে শিক্ষা দেওয়া।

* * *

আমরা কোনো নূতন কাজ করিতে চাহি না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে ভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির সেবা করিয়াছিলেন, যে আদর্শ তাঁহারা নিজেদের সামনে রাখিয়া ছিলেন এবং তাহার জন্য দিনরাত চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই আদর্শ অনুসরণকারী অনেক লোক যদি কোথাও একত্রিত হয় তবে সেখানে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে যাহা সংগঠনের পক্ষে অনুকূল। সমস্ত দেশে এইরূপ পবিত্র, শ্রদ্ধাপূর্ণ, ধ্যেয়নিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত, উৎসাহপ্রদ এবং নির্ভরশীল পরিবেশ গড়িয়া তোল। স্বয়ংসেবক যেখানে যাইবে সেখানেই সে যেন এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ অটুট রাখিবার জন্য স্বয়ংসেবক যেন সব সময় চেষ্টা করে। এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাহাকে অটুট রাখার মনোবৃত্তি একবার জাগরিত হইলে আর কোনো কিছুতে সঙ্ঘ ভয় পাইবে না।

* * *

সঙ্ঘের কাজ ও তাহার বিচারধারা আমাদের কোনো নূতন আবিষ্কার নহে। সঙ্ঘ আমাদের পরম পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম, আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি, আমাদের স্বতঃসিদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র এবং অনাদি কাল হইতে প্রচিলিত পরম পবিত্র ভগবাধ্বজকে সেই একই রূপে সকলের সম্মুখে আনিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে নবচেতনা আনয়ন করিবার জন্য যে সময়ে যে কার্যপদ্ধতি প্রয়োজন তাহা সঙ্ঘ গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া অন্য কোনো নূতন কথা স্বীকার করিতে সঙ্ঘ প্রস্তুত নয়।

* * *

সঙ্ঘ কোনো ব্যক্তি বিশেষকে গুরুস্থানে না রাখিয়া পরম পবিত্র ভগবাধ্বজকেই গুরু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইহার কারণ ব্যক্তি যতই মহান হোক সে কখনও পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় হইতে পারে না। অতএব ব্যক্তি-বিশেষকে গুরু হিসাবে স্বীকার না করিয়া আমরা সেই জয়িষ্ণু ও প্রভাবশালী ভগবাধ্বজকে গুরু হিসাবে স্বীকার করিয়াছি—যাহার মধ্যে আমাদের ইতিহাস, পরম্পরা এবং রাষ্ট্রের জন্য স্বার্থ-ত্যাগের কথা এবং রাষ্ট্রীয়ত্বের সমস্ত মূল কথার সমন্বয় হইয়াছে। এই ভগবাধ্বজ হইতে আমরা যে উৎসাহ পাই তাহা কোনো মানুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত উৎসাহ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

('ডাক্তারজীর বাণী' পুস্তিকা থেকে গৃহীত)